সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব

আয়োজক: ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সহযোগিতায়: পিদিম, হেক্স/ইপার

ভেন্যু: ইএসডিও অডিটোরিয়াম ও লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর

ঠাকুরগাঁও-৫১০০, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ১২-১৩, ২০২২

সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব

আয়োজক: ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সহযোগিতায়: পিদিম, হেক্স/ইপার

ভেন্যু: ইএসডিও অডিটোরিয়াম ও লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর

ঠাকুরগাঁও-৫১০০, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ১২-১৩, ২০২২

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০২২

সংগ্রহ এবং সংকলন

কাজী মোঃ সেরাজুস সালেকীন

সম্পাদনা

উৎপল চন্দ্র বর্ধন

ইসরাত বিজু

মোঃ শাহীন

প্রকাশক

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

কম্পিউটার কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন

মোঃ নাদিমুল ইসলাম

মুদ্রণ

শব্দকলি প্রিন্টার্স

৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০।

বাণী

বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলাদেশের এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাঙালি জাতিসত্তার সাথে পাহাড়ি-সমতলের বিভিন্ন ভাষা ও নৃগোষ্ঠীর চিরায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ বঙ্গীয় 'ব' দ্বীপকে সমৃদ্ধ করেছে নানাভাবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য নিরাপদ ও বাসযোগ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল দর্শন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানেও একই অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যার .০৯% (দশমিক শূন্য নয় শতাংশ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। আমাদের দেশে ৫০টি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাস করে (বাংলাদেশ গেজেট, ডিসেম্বর ২০১৯)। আমাদের দেশে ৫৪টিরও অধিক ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাস করে। যাদের সরকারি দলিল, আইন, নীতি, ঘোষণা ও দাপ্তরিক নথিতে আদিবাসী, উপজাতি, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'আদিবাসী'-হিসেবে অভিহিত করা হলেও এই নীতি প্রণয়নের সমসাময়িক কালে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন পাস হয়ে যাওয়ার পর, 'উপজাতি' বা 'আদিবাসী'র পরিবর্তে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' এখন অনেকটা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে স্থায়ী পরিভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংকটের মূলে প্রোথিত আছে অপ্রাতিষ্ঠানিক গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর শক্ত ভিত্তিতে থাকা কতিপয় মূল স্রোতধারার ভূমি খেকো প্রভাবশালীর দৌরাত্ম। এই প্রক্রিয়ায় এক-সময়ের সমতলের ভূস্বামী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে ভূমিহীনে। একইভাবে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, আর্থিক সংকট এবং মূলধারার কিছু মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের উদ্যোগ ও সহায়তা একটি ইতিবাচক ধারার সূচনা করেছে।

উন্নয়ন সহযোগী হেকস/ইপারের সহায়তায় ইএসডিও দেড়যুগেরও বেশি সময় ধরে সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন, ভূমি অধিকার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সুরক্ষায় সরকারি সেবায় অভিগম্যতা সহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং ইতোমধ্যেই এ-সকল উদ্যোগের সুফল এবং ইতিবাচক প্রভাবের ফলশ্রুতি অনেকাংশে 'সক্ষমকরণ পরিবেশ' প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

আনন্দের বিষয় পিদিম, হেকস/ইপারের সহায়তায় ঠাকুরগাঁও-এ দুইদিন ব্যাপী 'সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব' সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। আমরা গভীরভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই সম্মেলনে সমাগত সকলকে- বিশেষত, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, সিভিল সোসাইটি ও মিডিয়ার নেতৃবৃন্দসহ সকল অংশগ্রহণকারীকে।

প্রাণঢালা অভিনন্দন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিল্পী, কলাকুশলী, স্টল প্রদর্শনকারীবৃন্দকে তাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে অসাধারণ নৈপুণ্যের সাথে উপস্থাপনের জন্য।

হেকস/ইপারের সম্মানিত কান্ট্রি ডিরেক্টর ডোরা চৌধুরী, পিদিম ও কান্ট্রি টিম মেম্বারদের কার্যকর যুক্ততার কারণে ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসবটি সফলতা অর্জন করেছে। তাদের প্রতি আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা।

ইএসডিও টিম বিশেষত, প্রেমদীপ ও রিভাইভ টিমের প্রতিও রইল অনেক অভিনন্দন।

সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জয় হোক।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

শুভেচ্ছা বক্তব্য

সমতলীয় ভূমি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বহু নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর পদচারণায় সমৃদ্ধ একটি অনন্য এলাকা। মূল জনগোষ্ঠী বাঙালির পাশাপাশি সাওঁতাল, ওরাঁও, মুন্ডা, পাহাড়িয়া, মুশোহর, কড়া, নুনিয়া, তুরি, তেলি, তাঁতি, রাজওয়ার, মালো, মাহালী, মাহাতো, কুরমি, কোল, কোডাসহ বহুসংখ্যক নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে রাজশাহী-রংপুর বিভাগের এ সমতলভূমি অঞ্চলীয় ১৬টি জেলায়। এছাড়াও রয়েছে বিপুলসংখ্যক দলিত মানুষ, যাদের প্রায় সবাই শিক্ষা, সেবা, সুবিধাপ্রাপ্তির দিক থেকে মূলধারার জনগোষ্ঠীর তুলনায় পিছিয়ে আছে আকাশ-পাতাল ব্যবধানে। পাশপাশি হরিজন, ডোম, মুচি, জেলে এ ধারারই জনগোষ্ঠী, যারা নানা কুসংস্কারের শিকার হয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে এবং নিজেদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকছে।

ঐতিহ্যগতভাবে ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই এই বঙ্গিয় জনপদের আদি বাসিন্দা সমতলের এই জনগোষ্ঠিরা। বিপুল বৈচিত্রময়তার জীবনপ্রণালী, নিজস্ব ভাষা, খাদ্যাভাস, ধর্ম এবং সর্বোপরি বর্ণিল আচার এবং রঙিন সংস্কৃতি তাদের করেছে স্বতন্ত্র। এই মাটিরই আদিপ্রাণ এই জনগোষ্ঠি সমূহ, যারা কয়েক শতাব্দী ধরে এই জনপদের ভূমিপুত্র, ভূমিকন্যা, ভূমিসন্তান। কিন্তু, কালের পরিক্রমায় এবং জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় এবং পেশার কারণে বৈষম্যের শিকার এসব গোষ্ঠীসমূহ এবং সাথে রয়ে যাচ্ছে পশ্চাৎপদতা, শোষন ও বঞ্চনার বাস্তবতা।

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বাংলাদেশে বিগত সময়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে অগ্রগতি হলেও তাঁদের সাংবিধানিক সমঅধিকার, মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার এবং সমাজের মূলস্রোতধারায় একীভূত হওয়ার দাবিসমূহ পরিপূর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। সংখ্যালঘু তথা দলিত ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত করা না গেলে সরকারের জাতীয় উন্নয়ন অঙ্গীকার, বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। এই ভাবনা সামনে নিয়ে ২০১৮ সালে হেকস্ "পিদিম" নামে একটি জাতীয় পর্যায়ের এ্যাডভোকেসি কর্মসূচির সূচনা করে যা সমতলের আদিবাসী এবং দলিত জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় একটি যৌক্তিক ও অধিকারভিত্তিক উন্নয়নের দাবি জোরদার করার লক্ষ্যে এক সাথে কাজ করেছে।

উত্তরবঙ্গের এই নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিদের জীবনধারণ প্রণালী এবং তাদের বৈচিত্রময় সংস্কৃতি মূলধারার অন্যান্য জনগোষ্ঠিদের মাঝে তুলে ধরে, তাদের সেসব ঐতিহ্যের সাথে পরিচিতি এবং মেলবন্ধন করানোর জন্য ইএসডিও কর্তৃক প্রতিবছর এ ধরণের জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন প্রশংসার দাবী রাখে। তারই পরিক্রমায় এই বছর ডিসেম্বরে ইএসডিও ঠাকুরগাঁওয়ে "সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব-২০২২" শিরোনামে আরেকটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে। আমি এই জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজনের জন্য ইএসডিও-কে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি "পিদিম"কে এই উদ্যোগে পাশে থাকার জন্য।

ডোরা চৌধুরী
কান্ট্রি ডিরেক্টর
হেকস্ বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম দিন:
সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ৬

উদ্বোধনী অধিবেশন ৭

জন বক্তৃতা :
সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সংকট ও উত্তরণের পন্থা ১৪

কর্ম অধিবেশনঃ উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ ও প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী ১৯

তৃণমূল সংলাপ:
সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের গল্প ২২

দ্বিতীয় দিন: আদিবাসী মেলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ২৫

দুই দিনব্যাপী আয়োজিত কনভেনশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধমালা ৪৪

উত্তরবঙ্গে কৃষক বিদ্রোহ ও প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী ৫২

প্রথম দিনঃ সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন

তারিখঃ ১২ ডিসেম্বর ২০২২, সোমবার

মোট অংশগ্রহণকারীঃ ৩১৮ জন

ভেন্যুঃ ইএসডিও অডিটোরিয়াম, ইএসডিও প্রধান কার্যালয়, গোবিন্দনগর, কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

অতিথিদের সাথে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালকের বেলুন উড্ডয়ন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন

বেলা ১১ টায় ইএসডিও প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রধান অতিথি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য, রমেশ চন্দ্র সেন জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন শেষে উৎসব সংঙ্গীতে সমবেত ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীরা।

এর পরে বেলুন উড্ডয়ন ও মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে দু'দিনব্যাপী ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রধান অতিথি রমেশ চন্দ্র সেন ও অনুষ্ঠানের সভাপতি, হেকস্/ইপার-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর, ডোরা চৌধুরী এবং হেকস্/ইপার-এর অন্যান্য কর্মীবৃন্দ ।

ঠাকুরগাঁও-১ আসনের সংসদ সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন এবং হেকস্/ইপার প্রতিনিধি সাইবুন নেসা'র মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক জনাব শফি আহম্মেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক জনাব ফখরুল ইসলাম, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ওদরাতুল আকমাম, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব জুয়েল আহমেদ সরকার, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, পরিচালক (প্রশাসন) ড. সেলিমা আখতার এবং ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীরা।

রেজিস্ট্রেশন শেষ করে অংশগ্রহণকারীরা অধিবেশনে যোগদান করেন

উদ্বোধনী অধিবেশন

উদ্বোধনী অধিবেশনে অতিথিদের সাথে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের সঞ্চালনায় সমতলের আদিবাসীদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথম দিনের কার্যক্রম শুরু হয় ।

উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদানকালে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক, ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবার এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এখনও আমরা অর্জন করতে পারিনি, কেননা এখনও আমরা আমাদের আদিবাসীদেরকে বিশেষ করে সমতলের আদিবাসীদের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করতে পারিনি। SDGs ঘোষণা অনুযায়ী কাউকে পেছনে ফেলে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সম্ভব নয়। ড. জামান বলেন, দেশের ৫টি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রফেসরবৃন্দ এসেছেন, যাঁরা সমতলের আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা ও এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করবেন। পরিশেষে, ড. জামান, বঙ্গবন্ধুর কথার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের কেউ কখনও দাবায়ে রাখতে পারবে না, "আমাদের আদিবাসী ভাই-বোনদের কেউ কখনও দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের লোকায়ন জাদুঘর সংলগ্ন লেক-এ ফোটা লাল শাপলা দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অতিথিদের শুভেচ্ছা জানানো শেষে বীরাঙ্গনা সীতা হেমব্রম অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

ইএসডিও'র উন্নয়নকর্মী সুজন খান-এর সঞ্চালনায় এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আসাদুজ্জামান। তিনি উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, "সমতলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে হবে"। তিনি আরও বলেন, "আমরা সবাই মানুষ এটা নিশ্চিত করতে পারলে সবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা সবাই এ দেশের সম্পদ। একটি উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার । ক্ষুদ্র- নৃগোষ্ঠী বলে কোন শব্দ থাকবেনা। ইএসডিও-কে ধন্যবাদ তারা দেশ এবং পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী আর ক্ষুদ্র নয়"।

বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ক্রাইম এন্ড অপস্

প্রফেসর শফি আহমেদ বক্তৃতা রাখছেন।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক জনাব শফি আহম্মেদ। তিনি বলেন, আমরা যতই মুখে বলিনা কেন সবাই এক, মনে কিন্তু তা বিশ্বাস করি না। আমরা নিজেরা পুলিশকে অন্য মানুষ মনে করি। সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষ তো আছেই। আমাদের জন্মের উপর আমাদের কোন হাত/নিয়ন্ত্রণ নেই। মানুষ হিসেবে আদিবাসীদের আমরা এমনভাবে আলাদা করে রেখেছি যে আদিবাসী হিসেবে জন্মই যেন তাদের আজন্ম পাপ। এই একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা তাদের আলাদা করে রেখেছি। ইএসডিও তাদের পথ চলার শুরু থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে কাজ করছে। অনেক বছর ধরে তারা সমতলের আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করছে, তাদের অধিকারের জন্য কাজ করছে।

তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানান, "আমরা অনেক পাপ করেছি তার স্খলন করার সময় নেই। আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের মানবিক শিক্ষায় শিক্ষা দিতে পারি যাতে তারা আদিবাসীদেরকে, পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে না রেখে তাদেরকে সাথে নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়"। ইএসডিও সমাজে পরিবর্তন আনার যে কাজটি করছে সে জন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন শফি আহমেদ। তিনি আরো বলেন, "আমরা সবাই তো রক্ত মাংসেরই মানুষ। শুধু ভোটের দিনে নয়, সব সময়ই সব মানুষ সমান এই বোধ লালন করতে হবে মনের মাঝে এবং কাজে"। ইএসডিও'র এ প্রয়াস এবং চলমান সব প্রয়াস অব্যাহত থাকুক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে উনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করেন।

হেকস্/ইপার-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর, ডোরা চৌধুরী

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি, হেকস্/ইপার-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর, ডোরা চৌধুরী। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতেই ইএসডিও-কে ধন্যবাদ জানান এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবার জন্য। তিনি জানান, সমতলের আদিবাসীদের জীবন মানের উন্নয়ন করার জন্য তাদের যে কর্ম পরিকল্পনা সেগুলোকে আরও কীভাবে সমৃদ্ধ করা যায় সে জন্যই মূলত আমাদের দু'দিনব্যাপী এ আয়োজন। ইএসডিও এবং এর মতো আরও কিছু পার্টনার অর্গানাইজেশনের সাথে বেশ কিছু বছর ধরে এ কাজগুলো করে আসছি। আদিবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আপনাদের মনে রাখতে হবে সবার আগে আপনারা বাংলাদেশের নাগরিক। আপনাদের সমান অধিকার আছে"। সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে ডোরা চৌধুরী অনুরোধ করে বলেন, যেন তারা তাদের সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করেন। ডোরা চৌধুরী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন যে, হেকস্/ইপার সরকারের সক্ষমতার তুলনায় খুবই ছোট একটি প্রতিষ্ঠান। সরকারের ক্ষমতা অনেক বেশি এবং প্রচুর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সরকারের সুযোগ-সুবিধা এবং তার প্রাপ্যতার মাঝখানে যে ফাঁক সেটি নিরসনে এ অনুষ্ঠানে আরও কিছু দিক-নির্দেশনা পাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি তার টিমের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি, বক্তব্য প্রদান কালে।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি, ঠাকুরগাঁও-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সভাপতি জনাব রমেশ চন্দ্র সেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বলেন, "অনেক বছর শোষণ নিষ্পেষণ সহ্য করে, অনেক সংগ্রামের পরে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা দেশের প্রতিটা নাগরিকের দায়িত্ব"। তিনি আরও বলেন, "আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি সবার জন্য সুন্দর একটি দেশ গড়ার। আমাদের সরকার থাকাকালে কেউ বঞ্চিত হবে না"। আদিবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "লেখাপড়া শিখলে এবং কারিগরি জ্ঞানে শিক্ষিত হতে পারলে এ দেশে চাকুরির অভাব হবে না"। ইএসডিও পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে এবং তাদের এ আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে বিশ্বাস করেন তিনি। সবার সর্বাত্মক সহযোগিতায় দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

হেক্স ইপার-এর পিদিম প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার ইসরাত বিজু বক্তব্য প্রদান করছেন।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন পিদিম প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার ইসরাত বিজু, তিনি জানান, হেকস্ ২০০৬ সাল থেকে এদেশে অফিসিয়ালি কাজ করছে। কিন্তু এ দেশে ১৯৭১ সাল থেকেই হেকস্ মূলত মুক্তিযুদ্ধের শরণার্থীদের সহায়তার মাধ্যমে কাজ শুরু করে। ২০০৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এই এত বছর হেকস্ শুধু সমতলের আদিবাসীদের নিয়েই কাজ করছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এ দুই দিনের আলোচনায় নতুন চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ উঠে আসবে।

জন বক্তৃতা : সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সংকট ও উত্তরণের পন্থা

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর “সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সংকট ও উত্তরণের পন্থা ”শীর্ষক জন বক্তৃতা অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বক্তব্য প্রদান করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. রোবায়েত ফেরদৌস।

এই অধিবেশনে প্রধানবক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. রোবায়েত ফেরদৌস। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন ড. তুহিন ওয়াদুদ এবং দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব মোঃ জুয়েল আহমেদ সরকার। অনুষ্ঠানটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর শফি আহমদ সঞ্চালনা করেন।

ড. রোবায়েত ফেরদৌস তাঁর আলোচনার শুরুতেই বলেন, “আমরা যারা মেইনস্ট্রিম বাঙালি তারা বরাবরই আদিবাসীদের আলাদা করে রাখি, বিচ্ছিন্ন করে রাখি। সংবিধানে আদিবাসীদের কখনো নৃগোষ্ঠী, কখনো নৃতাত্ত্বিক মানুষ, কখনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিভিন্ন নামে অবহিত করা হয়েছে। আমরা যখন কাউকে ক্ষুদ্র বলছি তখন তো তাকে একদম ছোট করে ফেলছি। তারা কীভাবে বড় হবে”? ড. ফেরদৌস তাঁর আলোচনার

এক পর্যায়ে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের উপরে হওয়া নির্মম অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেন। শ্যামনগরে মুন্ডা কৃষককে জমির জন্য হত্যা, রাজশাহীর গোদাগাড়ীর ২ জন কৃষক সেচের পানি না পাওয়ার কারণে আত্মহত্যা, লাকি চাকমাকে অপহরণের পরে তার নাম পরিবর্তন করে বাঙালি নামকরণ, ধর্মের পরিবর্তন এবং মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে হওয়া মানে প্রতিরাতে সে ধর্ষণের শিকার হয় এবং পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হয়, রংপুরে দুর্গাপূজার সময় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে আগুন, জয়পুরহাটে অস্পৃশ্যতার কারণে সাঁওতালদের খাবারের দোকানে ঢুকতে না দেওয়া। তিনি জানান, নওগাঁয় তিন জন সাঁওতাল কৃষককে মেরে তাদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়। মৃত্যুই যেখানে চূড়ান্ত শাস্তি, সেখানে পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলার কারণ কী? ১৯৭১ সালে আমাদের ৩০ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি হয়। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, “রেপ” এর সাথে “লাস্ট” এর কোন সম্পর্ক নেই। যৌনক্ষুধার সাথে ধর্ষণের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ষণ পাওয়ার প্র্যাকটিসের এক ধরনের ইন্সট্রুমেন্ট। মানুষের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য এ ঘৃণ্য কাজটি করা হয়। তেমনিভাবে এই যে সাঁওতালদের মেরে তাদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে তাদের অপমান করার জন্য, সাঁওতাল জাতিকে অপমান করার জন্য।

রাষ্ট্র কতোটা ভালো চলছে বা খারাপ চলছে তার মাপকাঠি হচ্ছে সে “রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুরা যদি বলে রাষ্ট্র ভালো চলছে” তাহলে ভালো, অন্যথায় খারাপ। এক্ষেত্রে আমি, আপনি সংখ্যাগুরুদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

দেশে অনেক অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও মানবিক উন্নয়ন কতোটা হয়েছে সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ বলে মনে করেন ড. ফেরদৌস। যে মানবিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন আমরা দেখি, তা নির্মাণে আমরা এখনও হাজার মাইল দূরে বলে বিশ্বাস করেন তিনি।

মহামতি লেলিনকে উদ্ধৃতি করে বলেন, একটি দেশে যদি একজন মানুষও থাকে যার ভাষা আলাদা, যার পোশাক আলাদা, যার সংস্কৃতি আলাদা, রাষ্ট্রে তাকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। বাঙালি ছাড়াও এ রাষ্ট্রে ৭৫ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে উল্লেখ করে ড. ফেরদৌস রাষ্ট্রের সবাইকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান। রাষ্ট্রকে জাতি নিরপেক্ষ, ভাষা নিরপেক্ষ, লিঙ্গ নিরপেক্ষ, যৌন নিরপেক্ষ হতে হবে এবং এরকম একটি ইনক্লুসিভ রাষ্ট্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি মানবিক মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্র বলে তিনি মনে করেন।

সুপারিশসমূহ

১। সংবিধানে আদিবাসীদের যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে“উপজাতি হিসেবে” সেটা খুবই অপমানজনক। ILO Convension ১০৭ এবং ১৬৯ এবং ২০০৭ সালে জাতিসংঘের যে ঘোষণাপত্র আছে তার স্বীকৃতি আমাদের রাষ্ট্রে থাকা দরকার। অর্থাৎ দেশের সংবিধানে আদিবাসীদের “আদিবাসী” হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

২। আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি রাষ্ট্রের দিতে হবে।

৩। সমতলের আদিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র ভূমি কমিশন গঠন করা দরকার এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য একটি মন্ত্রণালয় দরকার।

৪। উন্নয়নের নামে আদিবাসীদের ভূমি দখল বন্ধ করতে হবে।

৫। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের জন্য আলাদা বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

৬। আদিবাসীদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাষ্ট্র, সরকার, GOs, NGOs সবাইকে মনোযোগী হতে হবে কেননা একমাত্র শিক্ষাই পারে সমাজে বৈষম্য দূর করতে।

৭। চাকুরিতে কোটা বাতিলের নামে সবার কোটাই বাতিল করা হয়েছে। আদিবাসীদের জন্য কোটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকা দরকার।

৮। জাতীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার পরিষদে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ দরকার।

বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্র। বহুজাতির, বহু ধর্মের, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির একটি বৈচিত্রপূর্ণ রাষ্ট্র। রাষ্ট্র পরিচালনার এই বহুত্ববাদী নীতি, এই বহুত্ববাদীতাই আমাদের মূল শক্তি। আমরা সীমিত সার্মথ্য নিয়ে এই বহুত্ববাদী নীতির স্বপ্নের দেশ নির্মাণে যে যার জায়গা থেকে কাজ করব এ প্রত্যাশায় এবং আদিবাসীদের জয় কামনা করে ড. ফেরদৌস তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

ইএসডিও'র সম্মানিত পরিচালক প্রশাসন ড. সেলিমা আখতার, হেকস্ ইপার কান্ট্রি ডিরেক্টর ডোরা চৌধুরী এবং সাইবুন নেছা, বীরাঙ্গনা সীতা হেমব্রম সহ মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন এবং "অপরাজেয় ৭১" এর রেপ্লিকা স্মারক প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। ইএসডিও'র সম্মানিত পরিচালক (প্রশাসন) ড. সেলিমা আখতার একে একে সীতা হেমব্রমসহ মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন এবং"অপরাজেয় ৭১" এর রেপ্লিকা স্মারক সম্মাননা প্রদান করেন।

সম্মাননা প্রদান শেষে বক্তব্য রাখেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন ড. তুহিন ওয়াদুদ।

ড. তুহিন ওয়াদুদ তার আলোচনার শুরুতেই গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের সাঁওতাল পল্লীর ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, যারা নির্যাতিতদের পাশে থেকে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কাজ করেছে তারাই আবার একটা সময় পরে নির্যাতক হিসেবে, শোষক হিসেবে আবর্তিত হয়েছে।

ইএসডিও'র সম্মানিত পরিচালক প্রশাসন ড. সেলিমা আখতার ড. তুহিন ওয়াদুদ কে উত্তরীয় পরিয়ে দেন এবং "অপরাজেয় ৭১" এর রেপ্লিকা স্মারক প্রদান করেন।

গণমাধ্যমে আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের কোন খবর আসে না। আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি আগ্রাসন আছে উল্লেখ করে ড. তুহিন ওয়াদুদ বলেন, আমরা আমাদের পথ চলায় ক্রমাগত আমাদের মূল থেকে সরে গিয়েছি। শিক্ষার যে উদ্দেশ্য মানুষ তৈরি হওয়া, সেখান থেকে সরে গিয়ে একটা সার্টিফিকেট সর্বস্ব জাতিতে পরিণত হয়েছি। অবচেতন মনে আমরা সে চিন্তা চেতনাকে লালন করে চলেছি। অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে আমরা আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই সেটা মানুষ হয়ে ওঠার ইতিহাস না।

শুধুএই বঙ্গ ভূখণ্ডে নয়, সারা পৃথিবী জুড়েই আদিবাসী আছে এবং তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলা হলেও তাদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে আমরা ব্যর্থ এবং কালের বিবর্তনে তা হারিয়েও যাচ্ছে বলে মনে করেন ড. তুহিন। সাঁওতালরা তাদের নিজের ভাষাটাকে রক্ষা করতে পারে নাই এবং রাষ্ট্রের কোন পৃষ্টপোষকতা না থাকার কারণে, জীবন-জীবিকার তাগিদে তারা ধর্মান্তরিত হচ্ছে, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

বক্তব্য প্রদান করছেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন ড. তুহিন ওয়াদুদ।

ড. তুহিন ওয়াদুদ তাঁর অলোচনার এক পর্যায়ে জানান তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাঁওতালী ভাষার কয়েকশত গান সংগ্রহ করেছেন এবং এগুলো সম্ভব হলে সাঁওতালী ভাষায়, বাংলা বর্ণে অর্থসহ সংরক্ষণ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
আমরা জাতিগত ভাবেই আমাদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারি নাই বলে বিশ্বাস ড. তুহিন ওয়াদুদ এর। আমরা একটা নাম রাখার ক্ষেত্রেও ভাষার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারি নাই। নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আদিবাসীদের তৎপর হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

“স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে আমরা আমাদের সংস্কৃতি, পোশাক, ভাষা সবই হারিয়েছি, হারাচ্ছি। শুধু যে আদিবাসীদের সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে তা নয়, মেইনস্ট্রিম বাঙালিরাও তাদের শেকড় ভুলে যাচ্ছে। আমাদের শেকড়ের সাথে যোগ থাকুক, সব বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতিসত্তা বেঁচে থাকুক” এই প্রত্যাশায় এবং সকলকে শেকড় সন্ধানী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

বক্তব্য প্রদানকালে দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব মোঃ জুয়েল আহমেদ সরকার।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব মোঃ জুয়েল আহমেদ সরকার। জনাব মোঃ জুয়েল আহমেদ সরকার তাঁর আলোচনার শুরুতে “PREMDIP” নামটির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ১৯৪৭ এর আগের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে আমরা বাঙালিরা শোষণ, নিপীড়নের শিকার একটি জাতি। ১৯৭১-এর আগের ২৫ টা বছর কঠিন একটা সময় পার করে আমরা যে স্বাধীন ব-দ্বীপটাকে আমাদের বলে দাবি করি সেটি একটি প্রেমময় দ্বীপ হবে এটি প্রত্যেকটা মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল যদিও আমরা জানিনা সেটা কতোটা করতে পেরেছি। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জুয়েল আহমেদ জানান, “স্বাধীনতার এতো বছর পরেও ৮৫% আদিবাসী ভূমিহীন। এটা এমন নয় যে তারা ন্যাচারালি ভূমিহীন বরং তাদের একটা সিস্টেমেটিকওয়েতে ভূমিহীন করা হয়েছে।” আদিবাসীদের মাঝে শিক্ষার হার মাত্র শতকরা পনের থেকে বিশ ভাগ এবং দারিদ্রতার হার আরো অনেক বেশি যা প্রায় ৬০ শতাংশ। ড. রোবায়েত স্যারের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে আদিবাসীরা উন্নয়ন দেখলে ভয় পায়। “পিকেএসএফ কাজ করার সময় আদিবাসী যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য TVET ট্রেইনিং এর বিষয়ে ঠাকুরগাঁও-এর পীরগঞ্জ উপজেলায় আদিবাসী যুবকদের সাথে কথা বলার সময় তাদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখতে পায়। তাদের কেউ একজন আমাকে প্রশ্ন করে, “গুম করে দিবেন না তো”? তাদের এই আতঙ্কের কারণ হলো বঞ্চনা। তারা প্রায় সব জায়গায় বঞ্চনার শিকার হয়।“দিনাজপুরের খাবারের হোটেলগুলোতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিছু হোটেলে ঢুকতে দিলেও তাদের আলাদা থালা গ্লাস নিয়ে যেতে হয়। আদিবাসীদের নিয়ে বড় পরিসরে কাজ এবং এই সম্মেলন আয়োজন করার জন্য ইএসডিওকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে ড. রোবায়েত ফেরদৌস তাঁর লেখা একটি বই ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর আসন-১ এর মাননীয় সংসদ সদস্য, মনোরঞ্জন শীল গোপাল। তিনি তার বক্তব্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কথা বলেন। তিনি বলেন, "আমরা ডান বাম, আওয়ামী লীগ, বিএনপি যে দলই করিনা কেন, আমাদের একটি জায়গায় এক হওয়া উচিৎ, সেটি হলো পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসা।" বর্তমান সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনা তাদের (পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী) ব্যাপারে অনেক আন্তরিক বলে উল্লেখ করেন তিনি। আদিবাসীদের সমাজ পরিবর্তনে অনেক অবদান আছে, তারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি আদিবাসীদের উপর অত্যাচার ও

বক্তব্য প্রদান করেন দিনাজপুর-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, মনোরঞ্জন শীল গোপাল।

ভূমি দখলের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, সকল দলের মানুষ আদিবাসীদের ভূমি দখলের ব্যাপারে এক। আইনি জটিলতার কারণে তাদের ভূমি উদ্ধার করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। তিনি বলেন, "আমি সংসদে তাদের বিষয়ে প্রায় কথা বলে থাকি।" আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের স্কুলে কমপক্ষে দুজন আদিবাসী শিক্ষক নেয়া উচিত এবং সর্বোপরি তিনি বলেন আদিবাসীদের মাদক থেকে মুক্ত করতে পারলেই তারা এগিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করেন মনোরঞ্জন শীল গোপাল।

"জন বক্তৃতা" অধিবেশন শেষে মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি থাকে। দ্বিতীয় অধিবেশনের পর পরই মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে "উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ ও প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী" শীর্ষক কর্ম অধিবেশন শুরু হয়।

কর্ম অধিবেশনঃ উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ ও প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী

কর্ম অধিবেশন সঞ্চালনা করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম।

অধিবেশনটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় সঞ্চালিত হয়। এ অধিবেশনে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও সমাজ গবেষক জনাব কালীরঞ্জন বর্মন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়ারদাতুল আকমাম এবং দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব হাসান জামিল।

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও সমাজ গবেষক জনাব কালীরঞ্জন বর্মন "উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ ও প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন।

কর্ম অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও সমাজ গবেষক জনাব কালীরঞ্জন বর্মন উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ ও প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনার শুরুতেই আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের উপর অন্যায় অত্যাচার, জুলুম এবং নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। তার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বলেন, এক ফেরিওয়ালা তার স্ত্রীকে হিন্দু মহিলা বলে অবজ্ঞা করেছিল। সেই থেকে তার স্ত্রী শাঁখা, সিঁদুর পরে না। এরকম পিছনের কারণ হল সংখ্যালঘুরা জাতি হিসাবে দুর্বল। আদিবাসীদের উৎপত্তি, ভাষা, সংস্কৃতি, বাসস্থান নিয়ে বিষদ আলোচনা করেন, সাঁওতালদের উপর নির্যাতন, ভূমি দখল, এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস আলোকপাত করেন। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভূমি রক্ষায় সরকারকে আরো বেশি সোচ্চার হতে হবে এ আশা ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা শেষ করেন।

বক্তব্য পেশ করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, ড. ওয়ারদাতুল আকমাম।

কালীরঞ্জন বর্মণ এর আলোচনা শেষে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, ড. ওয়ারদাতুল আকমাম। তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি জনাব কালীরঞ্জন বর্মণ এর উপস্থাপিত পেপার এর উপর পুনরায় আলোকপাত করেন। আদিবাসীদের উৎপত্তি, কৈর্বত আন্দোলন, উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, কৃষক বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ পেপারের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

বক্তব্য প্রদানকালে দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব হাসান জামিল।

আরো আলোচনা করেন দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব হাসান জামিল। তিনি আদিবাসীদের সংস্কৃতি সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। আদিবাসীদের কৃষি সমাজ ব্যবস্থা কেমন? এই প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন এর প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোকপাত করেন। সবশেষে, ইএসডিও এবং হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনার ইতি টানেন। ড. মো: ফখরুল ইসলাম এর সুন্দর সঞ্চালনায় অধিবেশনটির সমাপ্তি হয়।

সম্মাননা প্রদান শেষে অতিথিদের সাথে পরিচালক প্রশাসন ড. সেলিমা আখতার।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। ড. ফখরুল ইসলাম, কালীরঞ্জন বর্মন, ড. ওয়ারদাদুল আকমাম ও হাসান জামিল মহোদয়গণকে সম্মাননা প্রদান করেন ইএসডিও'র পরিচালক (প্রশাসন) ড. সেলিমা আখতার।

ড. রোবায়েত ফেরদৌস এর সাথে আরতি মার্ডি এবং সিংরাই সরেন।

সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব এর প্রথম দিনের কার্যক্রম শেষ হয় "সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের গল্প" শীর্ষক তৃণমূল সংলাপের মধ্য দিয়ে। উক্ত তৃণমূল সংলাপে সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. রোবায়েত ফেরদৌস। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও এর সদর উপজেলার নারগুনের কহরপাড়া ভিডিসি'র সভানেত্রী আরতি মার্ডি, পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনার গিলাবাড়ী ভিডিসি'র সভানেত্রী সরলা মূর্মূ এবং রাণীশংকৈল উপজেলার হোসেনগাঁও-এর রাউতনগর ভিডিসি'র সভাপতি সিংরাই সরেন।

গিলাবাড়ী ভিডিসি'র সভানেত্রী সরলা মূর্মূ।

তৃণমূল সংলাপে আদিবাসী প্রতিনিধিরা তাদের বিভিন্ন অসুবিধা ও সমস্যার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও পরামর্শ তুলে ধরেন। শুরুতেই তৃণমূল সংলাপে সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের গল্প শোনায় পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনার গিলাবাড়ী ভিডিসি'র সভানেত্রী সরলা মূর্মূ। তিনি তাদের সংস্কৃতি ও শিক্ষার কথা বলেন। তারা বর্তমানে পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হিসাবে শিক্ষাকে দায়ী করেন। আদিবাসীদের মাঝে এখনো শিক্ষিতের হার খুব কম, যার কারণে তাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের ভূমি দখল করে নিচ্ছে, চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে। তিনি এসব সমস্যার জন্য সরকারকে দায়ী করেন। কারণ সরকার চাইলে কারণ চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধান করতে পারে। তিনি তাদের ভূমি সমস্যার সমাধান ও সাঁওতালী ভাষায় বই ছাপানোর দাবি জানিয়ে, সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

বক্তৃতা রাখছেন সিংরাই সরেন।

এছাড়াও সদর উপজেলার নারগুনের কহরপাড়া ভিডিসি'র সভানেত্রী আরতি মার্ডি এবং রাণীশংকৈল উপজেলার হোসেনগাঁও-এর রাউতনগর ভিডিসি'র সভাপতি সিংরাই সরেন আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। শেষের দিকে বিভিন্ন সমস্যা, দাবি-দাওয়া এবং প্রশ্ন করার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া বিশেষ করে ভূমির সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে কথা বলেন।

বক্তব্য প্রদান করেন ঠাকুরগাঁও এর সদর উপজেলার নারগুনের কহরপাড়া ভিডিসি'র সভানেত্রী আরতি মার্ডি ।

তৃণমূলসংলাপ এর মধ্য দিয়ে আদিবাসী প্রতিনিধিরা তাদের যে দাবি-দাওয়া গুলো তুলে ধরে সেগুলো -

১। দেশের সংবিধানে "আদিবাসী" হিসেবে স্বীকৃতি

২। সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় এবং পৃথক ভূমি কমিশন গঠন

৩। শিক্ষার অধিকার এবং তাদের স্বভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা

৪। চাকুরিতে কোটা

৫। এ অঞ্চলে আদিবাসী সংস্কৃতি একাডেমি প্রতিষ্ঠা।

সাঁওতালী গানের সাথে সমবেত সকলের অংশগ্রহণ।

সবশেষে সাঁওতালী ভাষার সমবেত সংগীত ও ড. রোবায়েত ফেরদৌস স্যারের সঞ্চালনায় সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রথম দিনের অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় দিন: আদিবাসী মেলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

তারিখ: ১৩ ডিসেম্বর ২০২২, মঙ্গলবার
সময়: সকাল ১০:০০টা
মোট অংশগ্রহণকারী: ৪৩০ জন
ভেন্যু: লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর, আকচা, ঠাকুরগাঁও।

অতিথিদের সাথে নির্বাহী পরিচালক স্যারের বেলুন উড্ডয়ন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজশাহী-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, পার্লামেন্টারি ককাস অন ইনডিজিনাস পিপলস্ অফ বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলে হোসেন বাদশা। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC) এর সাধারণ সম্পাদক ও আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস এর যুগ্ম সমন্বয়ক জনাব জান্নাত-এ-ফেরদৌসী। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেকস্/ইপার এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব ডোরা চৌধুরী।

অতিথিরা আদিবাসী মেলার স্টলগুলো ঘুরে দেখছেন।

অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে অতিথিরা আদিবাসী মেলার স্টলগুলো ঘুরে দেখেন। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা স্টলগুলোতে প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, খাবার, সাজসজ্জাসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি তথা তাদের জীবন চিত্র তুলে ধরেন।

জাতীয় পতাকা এবং উৎসব পতাকা উত্তোলন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় পতাকা এবং উৎসব পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা এবং উৎসব পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় সঙ্গীত এবং উৎসব সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করছেন অতিথিবৃন্দ।

হেকস ইপারের কান্ট্রি ডিরেক্টরসহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিবৃন্দ মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বেলুন উড্ডয়নের মাধ্যমে দুইদিন ব্যাপী উৎসবের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদানকালে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। ড. জামান ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছে, মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহিদ এবং সর্বোপরি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৫ই আগস্টে নিহত সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে সমতলের আদিবাসীদের সামনে এগিয়ে নিয়ে আসতে সকল স্তরের মানুষের সহায়তা কামনা করেন তিনি এবং আদিবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তাদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য।

বক্তব্য রাখেন গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC) এর সাধারণ সম্পাদক ও আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস এর যুগ্ম সমন্বয়ক জনাব জান্নাত-এ-ফেরদৌসী।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC) এর সাধারণ সম্পাদক ও আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস এর যুগ্ম সমন্বয়ক জনাব জান্নাত-এ-ফেরদৌসী। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতেই ইএসডিওকে ধন্যবাদ জানান এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। আদিবাসী মেলায় দেখা স্টলগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে না আসলে এই অসাধারণ অভিজ্ঞতা তার হত না। চমৎকারভাবে আদিবাসীরা তাদের জীবন চিত্র তুলে ধরেছে এই স্টলগুলোর মাধ্যমে। তিনি বলেন, এ দেশ বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির দেশ এবং এই বৈচিত্র্যতাই আমাদের শক্তি।

মহান মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী নারীদের অবদান উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের জন্য জীবন বাজি রাখতে তারাও পিছু পা হননি। অসংখ্য আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছে কিন্তু তাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এবং তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। বক্তব্য শেষে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে "এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আনলো যারা, আমরা তোমাদের ভুলব না" গানটি পরিবেশন করেন।

বক্তব্য রাখছেন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা হাবিল হেমব্রম।

বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল স্যার।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা হাবেল হেমব্রম। তিনি তার বক্তব্যে তাদের অর্থাৎ আদিবাসীদের মানবেতর জীবনের কথা, তাদের দুঃখ- দৈন্যতার কথা তুলে ধরেন। ইএসডিও কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতেই বলেন "বাংলাদেশ যে শুধুমাত্র বাঙালিদের দেশ না তার উজ্জ্বল প্রকাশ আজকের এ অনুষ্ঠান।"ইএসডিও'র পায়ের নিচের মাটি অনেক শক্ত উল্লেখ করে তিনি হেকস্/ইপার কে ধন্যবাদ জানান ইএসডিও'র মত একটি যোগ্য প্রতিষ্ঠানের হাতে এ গুরু দায়িত্ব তুলে দেওয়ার জন্য। আদিবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, স্টলগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের জীবন তুলে ধরেছেন এবং তিনি সত্যিই অনেক অভিভূত আদিবাসীদের অভিযোজন ক্ষমতা দেখে। তিনি জানান, দুর্ভিক্ষে অনেক মানুষ মারা গেলেও আদিবাসীরা খুব কমই মারা গিয়েছে শুধুমাত্র তাদের অভিযোজন ক্ষমতার জন্য। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানান, দিন দিন বন জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সভ্যতার দৈত্য আদিবাসীদের আবাস নষ্ট করে ফেলছে।

তিনি বলেন আদিবাসীদের আমরা একটা "সম্প্রদায়" করে রেখেছি। তাদের "জাতি" পরিচয় দিতে হবে যেখানে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জাতির নিজস্বতা থাকবে।

আদিবাসীদের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সবার আগে সংবিধানে তাদের স্বীকৃতি প্রয়োজন। তিনি বলেন সংবিধানে বলা হোক "এ দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি, কিন্তু বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষ আছে এবং তারা আদিবাসী জাতিসত্তার মানুষ এবং সংবিধানের শেষে আদিবাসী জাতিসত্তার একটি তালিকা থাকা দরকার।"

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এত বেশি বিচিত্রপূর্ণ মানুষের বাস যে এ অঞ্চলকে তিনি "বৃহত্তর মিউজিয়াম" এর সাথে তুলনা করেন।

ড. মেসবাহ কামাল বলেন, "জ্ঞান মাটির কাছে। মাটির কাছে না এলে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা যায়না। বাঙালির শেকড় আদিবাসীতে।"

ড. মেসবাহ কামাল তার বক্তব্যের মাধ্যমে কিছু দাবি তুলে ধরেন।

১। আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন; ২। সমতলের আদিবাসীদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মত আলাদা মন্ত্রণালয়; ৩। আদিবাসীদের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ; ৪। এ অঞ্চলে আদিবাসী সংস্কৃতি একাডেমী প্রতিষ্ঠা।

বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, পার্লামেন্টারি ককাস অন ইনডিজিনাস পিপলস্ অফ বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলে হোসেন বাদশা।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, পার্লামেন্টারি ককাস অন ইনডিজিনাস পিপলস্ অফ বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলে হোসেন বাদশা। জনাব ফজলে হোসেন বাদশা তার বক্তব্যের শুরুতেই বলেন ১৯৭১ সালে আদিবাসীরাও তাদের তির, ধনুক দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করে। অথচ আজ এ দেশে তাদের কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন এবং পৃথক মন্ত্রণালয়ের দাবিকে তিনি ন্যায্য দাবি বলে উল্লেখ করেন।

তিনি তার আলোচনায় আদিবাসীদের হয়ে বেশ কিছু দাবি তুলে ধরেন। তার মধ্যে আদিবাসীদের ভাষার অধিকার এবং আদিবাসী কালচারাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা অন্যতম।

তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পরেও সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা ব্যর্থ, কারণ আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ।

ইএসডিও-কে আরও বড় পরিসরে এ আয়োজন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি তার জায়গায় থেকে সর্বাত্মক সহায়তা করার আশ্বাস জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল এবং জনাব জান্নাত-এ-ফেরদৌসী আদিবাসীদের উপর তাদের যৌথভাবে লেখা একটি বই ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে উপহারস্বরূপ প্রদানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী পর্বের সমাপ্তি হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দশটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দলের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা পরিবেশিত হয়। একে একে প্রতিটি দল গান, নাচের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

১। বিরলের তুড়ি সম্প্রদায় তাদের আঞ্চলিক ভাষায় গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন। বন্ধনা..., টিয়া ভালো কে মুনি...কদম তুলে কোকিল... গানগুলো পরিবেশিত হয়।

তুরি সম্প্রদায় এর পরিবেশনা।

ভুঞ্জার সম্প্রদায় এর পরিবেশনা।

মাহাতো সম্প্রদায় এর পরিবেশনা।

কড়া সম্প্রদায় এর পরিবেশনা।

মালো সম্প্রদায় এর পরিবেশনা।

সাঁওতাল সম্প্রদায় এর পরিবেশনা।

মাহালী সম্প্রদায় এর পরিবেশনা।

পাহান সম্প্রদায় এর পরিবেশনা।

মাহালি সম্প্রদায় এর পরিবেশনা।

ওঁরাও সম্প্রদায় এর পরিবেশনা।

অতিথিবৃন্দ মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

সম্মাননা প্রদান ও সমাপনী অনুষ্ঠান

সম্মাননা প্রদান ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুরর বিভাগের এডিশোনাল ডিবিশনাল কমিশনার জেনারেল মোঃ আবু জাফর, গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর রেঞ্জ-এর ডিআইজি জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ সাদেক কুরাইশী। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার সার্বিক
জনাব মোঃ আবু জাফর
বক্তব্য প্রদান করছেন।

বক্তব্য প্রদান করেন ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-কে ধন্যবাদ জানান যাদের সুযোগ ও সামর্থ্য হয় না তাদের অন্তত এক দিনের জন্য হলেও মাটি ও মানুষের সাথে যোগ করে দেওয়ার, তাদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আদিবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা নিজেরা যাতে তাদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং এ যাত্রায় ইএসডিও'র সাথে তারাও পরোক্ষভাবে হলেও শামিল।

পরিশেষে, বিজয়ের মাসে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারসহ মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল শহীদদের রুহ-এর মাগফেরাত কামনা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে বাংলাদেশ সে বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সহায়তা করার আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর রেঞ্জ-এর ডিআইজি জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ জানান, সরকার অসংখ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামনে এগিয়ে আনতে কাজ করছে। আদিবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি আপনাদের নিজেদেরও নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।"

অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন এবং ঠাকুরগাঁও জেলার একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ"অপরাজেয় ৭১" এর সম্মাননা স্মারক তুলে দেন ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন ও ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. সেলিমা আখতার।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন এবং ঠাকুরগাঁও জেলার একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ "অপরাজেয় ৭১" এর সম্মাননা স্মারক তুলে দেন ইএসডিও'র পরিচালক (প্রশাসন) ও ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. সেলিমা আখতার।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আংশগ্রহণকারী আদিবাসী দলগুলোকে পুরস্কার প্রদান।

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন গণমাধ্যমকর্মীদের।

অনুষ্ঠান চলাকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. জামান বলেন, দেশবাসীর কাছে সমতলের আদিবাসীদের জীবন চিত্র তুলে ধরার জন্য এবং তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইএসডিও এ বছর দ্বিতীয় বারের মতো আদিবাসী মেলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করেছে।

সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

সংবাদ সম্মেলন

সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব এর আগের দিন অর্থাৎ ১১ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের সাথে এক সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ড. জামান বলেন, এবারের কনভেনশন প্রথম কনভেনশন এবং দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সাংবাদিকদের শিক্ষা, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণে ইএসডিও'র অর্জন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান জানান "ইএসডিও ড্রপ আউট স্টুডেন্টদের নিয়ে স্টাডি করছে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকল্পে এডভোকেসি করা হচ্ছে এবং বেসিক সার্ভিস প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।"

যে সমস্ত কালচারাল ইভেন্ট বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ড.জামান জানান, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে কোলাবরেটলি স্টাডি করা হচ্ছে এবং আদিবাসী সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন বই প্রকাশিত হয়েছে।

দলিতদের জন্য পরিকল্পনা কী সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ড. জামান জানান, সামাজিক সম্পৃক্তকরণে সরকার বারাবার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ইএসডিও আদিবাসীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় কী করছে এমন প্রশ্নের জবাবে ড. জামান আদিবাসী কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

ভেন্যু: ১২ ডিসেম্বর ২০২২, ইএসডিও অডিটোরিয়াম
ইএসডিও প্রধান কার্যালয়, গোবিন্দনগর, কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও।
১৩ ডিসেম্বর ২০২২, লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর
পূর্ব আকচা, ঠাকুরগাঁও।
সময়: প্রতিদিন সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকেল ৫:০০ টা

HEKS EPER Bread for all

সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব

National Convention & Cultural Festival of Plain Land Ethnic Communities in Bangladesh

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
সহায়তায়: PIDIM প্রকল্প, হেক্স/ইপার

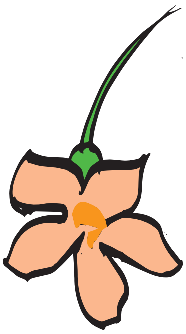

সুধী,
মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা নিন।
আগামী ১২-১৩ ডিসেম্বর, ২০২২ হেক্স/ইপার ও ইএসডিও'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

১২ ডিসেম্বর ২০২২ এ অনুষ্ঠিতব্য উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন **জনাব রমেশ চন্দ্র সেন**, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও-১ ও সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন **জনাব মনোরঞ্জন শীল গোপাল**, মাননীয় সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-১, **জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান**, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও-৩ এবং দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা **জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী**। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন **জনাব ডোরা চৌধুরী**, কান্ট্রি ডিরেক্টর, হেক্স/ইপার।

১৩ ডিসেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্বোধন করবেন **জনাব ফজলে হোসেন বাদশা**, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-২ ও প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্টারী ককাস অন ইনডিজিনিয়াস পিপলস্ অফ বাংলাদেশ এবং গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট নারী সংগঠক ও সাবেক প্রেসিডেন্ট, দি ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) **জনাব পারভিন মাহমুদ**।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন **জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম**, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন **জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান**, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও; **জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন**, পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও; **জনাব মুহাম্মদ সাদেক কুরাইশী**, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও এবং **জনাব ডোরা চৌধুরী**, কান্ট্রি ডিরেক্টর, হেক্স/ইপার।

সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রতিটি পর্বে আপনাকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

গভীর আন্তরিকতায়
আয়োজকদের পক্ষে

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

অনুষ্ঠানসূচি

১২ ডিসেম্বর ২০২২, সোমবার

ভেন্যু: ইএসডিও অডিটোরিয়াম, ইএসডিও প্রধান কার্যালয়, গোবিন্দনগর, কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

সকাল ১১:০০ : আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ

সকাল ১১:১৫ : **উদ্বোধনী অধিবেশন**

উদ্বোধক

বীরঙ্গনা সীতা হেমব্রম

রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও

প্রধান অতিথি

জনাব রমেশ চন্দ্র সেন

মাননীয় সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও-১

ও সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

গেস্ট অব অনার

জনাব মনোরঞ্জন শীল গোপাল

মাননীয় সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-১

জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান

মাননীয় সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও-৩

জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী

দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা

সভাপতি

জনাব ডোরা চৌধুরী

কান্ট্রি ডিরেক্টর, হেক্স/ইপার

দুপুর ১২:০০ : **জন বক্তৃতা: সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সংকট ও উত্তরণের পন্থা**

প্রধান বক্তা

ড. রোবায়েত ফেরদৌস,অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচক

ড. তুহিন ওয়াদুদ, ডীন, কলা অনুষদ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

জনাব মোঃ জুয়েল আহমেদ সরকার

বিভাগীয় প্রধান, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

সঞ্চালক

প্রফেসর শফি আহমেদ

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাবেক অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দুপুর ১:৩০ : মধ্যাহ্ন বিরতি

দুপুর ২:৩০ : **কর্ম অধিবেশন: উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ ও প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী**

জনাব কালী রঞ্জন বর্মণ

সমাজ গবেষক ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকার

আলোচক

প্রফেসর ড. ওয়ারদাতুল আকমাম

অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব হাসান জামিল

বিভাগীয় প্রধান, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

সঞ্চালক

প্রফেসর ড. মো: ফখরুল ইসলাম, অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিকেল ৪:০০ : **তৃণমূল সংলাপ: সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের গল্প**

আলোচক

জনাব আরতি মার্ডি, সভানেত্রী, কহরপাড়া ভিডিসি, নারগুন, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও

জনাব সরলা মূর্মু, সভানেত্রী, গিলাবাড়ী ভিডিসি, বৈরচুনা, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

জনাব সিংরাই সরেন, সভাপতি, রাউতনগর ভিডিসি, হোসেনগাঁও, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও

সঞ্চালক

ড. রোবায়েত ফেরদৌস,অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩ ডিসেম্বর ২০২২, মঙ্গলবার

ভেন্যু: লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর, আকচা, ঠাকুরগাঁও

সকাল ১০:০০ : আদিবাসী মেলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

উদ্বোধক

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-২

ও প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্টারী ককাস অন ইনডিজিনিয়াস পিপলস্ অফ বাংলাদেশ

গেস্ট অব অনার

জনাব পারভিন মাহমুদ, বিশিষ্ট নারী সংগঠক ও সাবেক প্রেসিডেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)

বিকেল ৩:৩০ : সম্মাননা প্রদান ও সমাপনী অনুষ্ঠান

প্রধান অতিথি

জনাব মোঃ সাবিবুল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর

বিশেষ অতিথি

জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও

জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও

জনাব মুহাম্মদ সাদেক কুরাইশী, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও

জনাব ডোরা চৌধুরী, কান্ট্রি ডিরেক্টর, হেক্স/ইপার

সভাপতি

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সংকট ও উত্তরনের পন্থা

রোবায়েত ফেরদৌস

" আদিবাসীদের জোর করে তাঁদের এলাকা বা ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না; যে-সব ভূমি, এলাকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ আদিবাসীরা বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখল করে আসছে বা ব্যবহার করে আসছে, তার উপর আদিবাসীদের অধিকার রয়েছে; রাষ্ট্র এ-সব ভূমি, অঞ্চল ও সম্পদের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং এ ধরনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে আদিবাসীদের রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ভূমি মালিকানা প্রথাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে।" (আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র, ২০০৭)

১.১.গেলো দু-তিন বছরে সমতল ও পাহাড়ের আদিবাসীদের ভূমি-সমস্যা, দেশত্যাগ ও মানবাধিকার নিয়ে বেশ কিছু সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে যে-সব বিষয় ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরা হয়েছে আজকের আলোচনার শুরুতেই আমি চেষ্টা করছি তার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরার জন্য যাতে এখানে উপস্থিত সবার কাছে সমস্যার একটি প্রকৃতি ও ধরন উপলব্ধ হয়।

ক. একটা বড় সমস্যা আদিবাসীদের দেশত্যাগ এবং এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আদিবাসের ভূমি থেকে উচ্ছেদ এবং উচ্ছেদ আতঙ্ক। ভূমিই আদিবাসীদের জীবন এবং জীবিকা। নিজ বাসভূমি থেকে যখন তারা উচ্ছেদের শিকার হন কিংবা তাদের আবাদি জায়গা যখন দখল হয়ে যায় তখন নিরুপায় আদিবাসীদের আর কিছু করবার থাকে না, তারা বাধ্য হন দেশত্যাগে। আদিবাসীদের দেশত্যাগ রোধে, মানবাধিকার কর্মী ও আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়েছে যে, তাদের বসতভিটা ও ফসলি জমি সুরক্ষায় বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে। কারণ দেশের প্রচলিত আইন তাদের এবং সংখ্যালঘুদের দেশান্তর রোধ করতে পারছে না। আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাসের পক্ষ থেকে আগামী সংসদে এ- সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপন করা খুবই প্রয়োজন। দেশ থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের দেশান্তর হওয়ার তথ্য খুবই দুঃখজনক; মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল স্বাধীন দেশের মানুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা। তা সম্ভব হয়নি। ক্ষমতাসীনদের মদদে শক্তিশালী গোষ্ঠী প্রান্তিক মানুষের জমি দখল করে চলেছে প্রতিদিন এবং প্রতিনিয়ত। তাদের উপর চলছে সীমাহীন নিপীড়ন ও নির্যাতন। আদিবাসী নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। তারা কোনো প্রতিকার পাচ্ছেন না। তাই চলছে নীরবে দেশ ত্যাগ। নাগরিক অধিকারের দাবি বাঙালিদের আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন। ভূমি দখল ও অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে ম্রো আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার পাঁয়তারা চলছে। কিছুদিন আগে উচ্ছেদ আতঙ্কে প্রায় ১০০ ম্রো পরিবার সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে গেছে। (সমকাল, ১৯ আগস্ট ২০১৮)

খ. আদিবাসীদের জীবন বননির্ভর। আদিবাসীরা বনকে দেখে, জীবনের অংশ হিসেবে। অথচ বনবিভাগ এসব মানুষকে বিবেচনা করে, প্রতিপক্ষ হিসেবে। বনবিভাগ বা বন আইন আসার আগেও বন ও বনবাসী মানুষ ছিলো। বনবিভাগ সৃষ্টি হওয়ার পরই বন ধ্বংস শুরু হয়েছে। যত দিন বনবাসী মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি না মিলবে, ততদিন বনের বিনাশ রোধ হবে না। ১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার বন আইন করেছিলো বন থেকে রেলওয়ে ও জাহাজের জন্য কাঠ সংগ্রহ করার জন্য। বনের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা ছিলো না। ভারতসহ অন্যান্য দেশে পুরনো বন আইন সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে। বাংলাদেশে তা হয়নি। বনজীবী আদিবাসী ছাড়া বন সংরক্ষণ সম্ভব নয়। এ জন্য বননীতি প্রণয়নের আগে বনবাসীদের সাথে আলোচনা করে তাদের মতামত ও সম্মতি গ্রহণ করা উচিত। বন বিভাগের কর্মকর্তাদের বোঝা উচিত তাদের দায়িত্ব বনের উপকার করা, বননির্ভর মানুষকে অপমান করা নয়। এ জন্য বন বিভাগকে আরো সচেতন হতে হবে। যে-সব বনখেকো তৈরি হয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু এসব বনখেকোকে শাস্তি না দিয়ে সরকার কখনও কখনও নিজেই বনখেকোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বন সম্প্রসারণের নামে সাইনবোর্ড সম্প্রসারণের কোনো অর্থ নেই। গেলো বছর কক্সবাজারে ৭০০ একর বন উজাড় করে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি তৈরির পরিকল্পনা নেয়।

ওখানে যেসব কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ পাবেন, সেসব কর্মকর্তার বনের প্রতি আদৌ কি কোনো মায়া জন্ম নেবে? সরকারের জমির দরকার হলে চোখ পড়ে বনের জমির উপর। পরে নাগরিকদের চাপে তা বাতিল করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ গাজীপুরে বনবিভাগের ৫ একর এবং একমাত্র উপকূলীয় পাহাড়ি বন মহেশখালীতে ১৭৫ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। সরকার এভাবে অধিগ্রহণ করতে থাকলে বন হরিয়ে যাবে। বননির্ভর জাতিগোষ্ঠীর সাথে যতদিন সুসম্পর্ক না হবে, ততদিন বন বিনাশ রোধ হবে না। (সমকাল ২৭ জুন ২০১৯)

ব্রিটিশ সরকার বন আইন করেছিলো বাণিজ্যিক প্রয়োজনে। বনের প্রতি তাদের যেহেতু কোনো জবাবদিহিতা ছিল না তাই এ আইনে বনবিভাগের কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা লেখা নেই। ঔপনিবেশিক বন আইনের পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। এক ধরনের অস্বচ্ছতা ও অদক্ষতা বন বিভাগের কাজের মধ্যে রয়ে গেছে। আর সরকার সেটা জানে। তাই যখনই সরকারের কোনো জমির দরকার হয়, তখন তার চোখ পড়ে বনবিভাগের জমির উপর। আর বনবিভাগ তা দিয়ে দেয়। বননির্ভর মানুষের অধিকার দিয়ে ভারতে বন সংরক্ষণ আইন হয়েছে নতুন করে। নেপালেও সংশোধন করে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। (প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০১৯)

গ. আদিবাসী জাতিগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ তাদের ওপর সব ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে একটি ‘আদিবাসী অধিকার সুরক্ষা আইন’ প্রণয়ন করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করে আদিবাসীদের জোরপূর্বক দেশান্তরকরণ প্রক্রিয়া বন্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে। আদিবাসীদের আর্থ-সামজিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জাতীয় বাজেটে আদিবাসীদের বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০০৭ সালে গৃহীত আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র অনুসমর্থন ও বাস্তবায়ন, আইএলও কনভেনশন ১০৭ বাস্তবায়ন ও ১৬৯ নম্বর কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করতে হবে। সমতল অঞ্চলের অদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য ‘ভূমি কমিশন’ গঠন করা জরুরি এবং মধুপুর গড়ে গারো ও কোচদের ভূমিতে ঘোষিত রিজার্ভ ফরেস্ট বাতিল করতে হবে। মৌলভীবাজার জেলার ঝিমাই ও নাহার খাসিয়া পুঞ্জির খাসিয়াদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা এবং চা বাগানের লিজ বাতিল করতে হবে। (কালের কন্ঠ, ৭ আগস্ট ২০১৮)

১.২. বিশ্বের ৫ টি মহাদেশের ৯০টি দেশে কমপক্ষে ৫ হাজার আদিবাসী জাতির মানুষ বাস করছেন। তাদের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট মানুষের প্রায় ৬% সংখ্যার হিসেবে ৪০ কোটিরও বেশি আদিবাসী পৃথিবীতে বসবাস করেন– যারা কথা বলেন ৪ হাজারেরও বেশি ভাষায়। আদিবাসীরা সবাই মিলে পৃথিবীর ২০% এরও বেশি ভূখণ্ড জুড়ে বাস করছেন এবং বিশ্বের ৮০% এরও বেশি সাংস্কৃতিক ও জীববৈচিত্র্য প্রতিপালন ও রক্ষা করে চলেছেন। (তথ্যপত্র: পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি, ২০১১) ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক যুগ থেকে বিশ্বের ৯০টিরও বেশি দেশে বসবাসকারী আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ওপর চলমান শতাব্দীব্যাপী বৈষম্য ও জাতিগত আগ্রাসন জাতিসংঘ স্বীকার করেছে। (আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র, ২০০৭) অস্ট্রেলিয়ার নর্দান টেরিটরির এক প্রবীণ আদিবাসী নেতার উক্তি: ‘ভূমিই আদিবাসীদের অস্তিত্বের কেন্দ্র বিন্দু। ভূমি আমাদের ঠিকানা, অস্তিত্ব। ভূমি আছে বলে জীবন এত গতিময়। ভূমি জীবনের প্রতীক। এ ভূমি আমাদের, আমরাও ভূমির। ভূমিতে আমরা বিশ্রাম নেই। আমরা ভূমি থেকে আসি, আবার ভূমিতে ফিরে যাই।’ বাংলাদেশে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী ছাড়াও প্রায় ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার ৫০টিরও অধিক আদিবাসী মানুষ স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাদের জীবন, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আদিবাসী জনগণের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। (ঘোষণাপত্র, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০১২) এ জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ লাখ মানুষ দেশের ৩৫টিরও অধিক জেলায় বাস করেন। এর মধ্যে তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে ১৪ জাতির মানুষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বসবাস করছেন। আয়তনে এ তিন জেলা দেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত; এর বাইরে সমতলের ৩০টিরও বেশি জেলায় আদিবাসী জাতির মানুষ বসবাস করেন। বাংলাদেশ একটি

বহুত্ববাদী রাষ্ট্র, যদিও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে একে ঠিক স্পষ্ট করে গ্রহণ করা হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানেও রাষ্ট্রের এই বহুত্ববাদী চরিত্র অনুপস্থিত। সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা, বসবাসরত সকলকে বাঙালি বলে চিহ্নিত করে রাষ্ট্রীয় চরিত্রে 'বাঙালি মুসলমান'র আধিপত্যকে জোরদার করা হয়েছে; একক জাতীয়তাবাদের প্রাবল্যকে স্বাগত জানানো হয়েছে; রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক চরিত্র তৈরি করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের অপরাপর বৈচিত্র্য ও ভিন্নতাকে অস্বীকার করা হয়েছে; শাসকবর্গের এহেন উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক চেতনাজাত মানসিকতা জারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জাতিসমূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার যে কোনো জো নেই, তা শাসকবর্গও জানেন। বাংলাদেশে আদিবাসী ইস্যুটির প্রকৃতি তাই খুবই জটিল রূপ নিয়েছে; এর সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শ, ধর্মীয় মতাদর্শ ও আঞ্চলিক রাজনীতির বিভিন্ন দিকমাত্রা জড়িত। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যে রাজনৈতিক আদর্শ থেকে আদিবাসী ইস্যুটিকে বিবেচনা করে, বিএনপি ঠিক সেভাবে দেখে না; আবার আদিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকারের বিষয়টিকে ইসলামী মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলো যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে বাম মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান তার বিপরীতে। আদিবাসী ইস্যুর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর 'ভারতমুখীনতা' ও 'ভারতবিরোধী' রাজনৈতিক মনোভাবেরও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। (রোবায়েত ফেরদৌস, ২০১৩)

১.৩. জাতিসংঘ সনদে আদিবাসী ভূমি অধিকারঃ আদিবাসী অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ ও ঘোষণাপত্র যা আছে তাহলো জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র, ২০০৭; নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ, ১৯৬৬; আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ ও ১৬৯; শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯; জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার ঘোষণাপত্র, ১৯৯২। এসব ছাড়াও সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, ইউনেস্কোর বিভিন্ন সনদ ও ঘোষণা, ভিয়েনা বিশ্ব সম্মেলন, জীববৈচিত্র্য সনদ এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন দলিলে আদিবাসীদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনডিপি, এডিবি, ইফাড, ডানিডা, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নসহ অনেকের আদিবাসী বিষয়ে পলিসি আছে। আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রে আদিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কথা বলা আছে। এ ঘোষণাপত্রের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে, 'আদিবাসীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের বলে তারা স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ণয় করে এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করে।' এছাড়াও আদিবাসীদের ভূমির অধিকার, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতি এবং আদিবাসী জ্ঞানের উপর অধিকারের বিষয় ঘোষণাপত্রে যুক্ত আছে। আদিবাসী ঘোষণাপত্রের ৪৬টি ধারার ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, আদিবাসীদের জোর করে তাদের এলাকা বা ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। ঘোষণাপত্রের ২৬ ধারায় বলা হয়েছে যে সব ভূমি, এলাকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ আদিবাসীরা বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখল করে আসছে বা ব্যবহার করে আসছে, তার উপর আদিবাসীদের অধিকার রয়েছে। আবার বলা হয়েছে, রাষ্ট্র এ সব ভূমি, অঞ্চল ও সম্পদের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং এ ধরনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে আদিবাসীদের রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ভূমি মালিকানা প্রথাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। এছাড়াও আদিবাসীদের নাগরিকত্ব, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, অধিকারের সমতা, মর্যাদা, আদিবাসী নারী, তরুণ, শিশু ও প্রবীণদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্রে স্থান পেয়েছে। সদস্যরাষ্ট্রের ১৪৩টি দেশ এ ঘোষণাপত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ভোটদানে বিরত ছিল ১১টি দেশ যার মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। এশিয়ারও প্রায় সকল দেশ ঘোষণার পক্ষে ভোট দিয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ফিলিপাইন থেকে শুরু করে ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ, এমনকি পাকিস্তান পর্যন্ত আদিবাসী ঘোষণাপত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছে। প্রত্যাশা ছিল শাসকগোষ্ঠী এই সত্য মেনে

নেবে যে, বাংলাদেশ একটি বহু ভাষা, বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতির এক বৈচিত্রপূর্ণ দেশ এবং এর মধ্য দিয়ে সকল জাতির পরিচয়, অধিকার ও সংস্কৃতিকে স্থান দেবে; এভাবেই রাষ্ট্র হয়ে উঠবে সবার; কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার যে বহুত্ববাদী নীতি বা বৈচিত্র্যের ভেতরে যে সংহতি তাকে নির্লজ্জভাবে পরিহার করে সংবিধানে ৯ অনুচ্ছেদে যুক্ত করা হয়েছে, "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট বাঙালি জাতি"র মতো অসত্য বাক্য। বাংলাদেশ কোনো একক ভাষা বা একক জাতির রাষ্ট্র নয়। বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও আরো জাতির মানুষ বাস করে এবং তারা বাংলায় নয়, তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলেন। সংশোধিত সংবিধান এদেশে বসবাসরত অন্য ভাষাভাষীর মানুষের মাতৃভাষাকেও পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছে। সংবিধানে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম হলেও অন্য ধর্মগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করেছে কিন্তু দেশের অন্য জাতিসমূহের ভাষার অস্তিত্বের ব্যাপারে সংবিধান ভয়ঙ্কর শব্দহীন এবং নিশ্চুপ। (রোবায়েত ফেরদৌস, ২০১১)। একুশ আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে। বাংলাদেশে বসবাসরত ৫০ টিরও বেশি জাতিগোষ্ঠীর নাগরিকগণ প্রায় ৩০টির মতো ভাষায় কথা বলেন; সংবিধানে এর স্বীকৃতি নেই। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪-এর ধারা ২২.১ ও ২২.২ ধারায় আদিবাসীদের ভূমি সুরক্ষা, পার্বত্য চুক্তির অবশিষ্টাংশ বাস্তবায়নসহ তাদের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু পরের ইশতেহারগুলোতে তারা আদিবাসী শব্দের ব্যবহার থেকে বিরত থাকে এবং পরে সংবিধানে আদিবাসী বোঝাতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জাতীয় শব্দ যুক্ত করে এবং তাদের সব প্রতিশ্রুতি কর্পুরের মতো উবে যায় সিংহাসনের হাতলে হাত রাখলেই।

২. ভূমিঃ দখল-উচ্ছেদ-সুশাসনঃ বর্তমান বাংলাদেশে ভূমি নিয়ে ভয়ংকর সব অপশাসন আর কুশাসন চলছে; ভয়ংকর সব রক্তাক্ত কাণ্ড চলছে ভূমি নিয়ে; স্বত্বাধিকারের স্বার্থে চলছে দখল-পাল্টা দখল, নির্যাতন-জবরদস্তি, মামলা-হামলা, খুন-হত্যা-ধর্ষণ; কেবল আদিবাসীদের ভূমি নিয়ে নয়; সংকট চলছে সব ধরনের ভূমি নিয়ে; রাজনৈতিক সমস্যা বাদ দিলে বাংলাদেশের বেশিরভাগ সমস্যার কেন্দ্রে এই ভূমি; আইন, বিধি, মানবাধিকার ও জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে কৃষিজমি, বনভূমি দখল, অধিগ্রহণ ও বরাদ্দ প্রদান চলছে; ফি বছর বাংলাদেশ এক শতাংশেরও বেশি হারে কৃষি জমি হারাচ্ছে; নির্বিচারে কৃষি জমিতে বসত-বাড়ি, শিল্প-কারখানা হচ্ছে; ভূমি খেকো আর ভূমি দস্যুরা খাল-বিল-নদী-জলাভূমি দখল করে নিচ্ছে; মহোৎসব চলছে হাউজিং আর রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের; গরিব-প্রান্তিক মানুষরা বাধ্য হচ্ছে স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে তাদের জমির অধিকার হস্তান্তরে; চরাঞ্চলের জায়গা, পতিত ভূমি আর সরকারি খাস জমি স্থানীয় প্রভাবশালী আর লাঠিয়ালরা করায়ত্ত করছে; বাড়ছে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা; আবাসন প্রকল্পের নামে ভূমি দখলের প্রক্রিয়ায় সামরিক-আধাসামরিক-পুলিশবাহিনী–কেউই পিছিয়ে নেই; নতুন নতুন সেনানিবাস, বিজিবির সেক্টর সদর দপ্তর, সেনাছাউনি কিংবা প্রতিরক্ষা স্থাপনা সম্প্রসারণের কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি অনুৎপাদনশীল খাতে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে যতো মামলা-মোকাদ্দমা আছে তার ৭০ ভাগেরও বেশি মামলা ভূমিকেন্দ্রিক। আপনারা কি জানেন, ঢাকা শহরের বেশিরভাগ বিত্তবানের গাজীপুর-আশুলিয়ায় বিশাল জায়গা ঘিরে বাগানবাড়ি/প্রমোদ উদ্যান আছে? টাকা থাকলেই কি আবাদি/কৃষি জমিতে এভাবে বাড়ি করা যায়? ভূমি নীতি/আইন, পরিবেশ নীতি/আইন, নদী/জলাভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা – এদেশে কোনো কিছুর তোয়াক্কা কেউ করছে না। ভূমি অপশাসনের বিস্তৃতি কতো দূর পৌঁছেছে তা বোঝা যাবে যদি আমরা বিভিন্ন ক্ষমতাধর ব্যক্তি/সংস্থা কর্তৃক খেলার মাঠ, বিদ্যালয়ের জমি, পার্ক, উদ্যান, খোলা জায়গা ক্রমশ দখলি প্রক্রিয়া খেয়াল করি। কলাবাগান খেলার মাঠ দখল ও নাগরিকদের চাপে তা বাতিল করা এর সর্বশেষ উদাহরণ। কয়েক বছর আগে ৮টি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার শৈলাট গ্রাম, কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়ন, বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলা, পাবনার চাটমোহর উপজেলার ছাইকোলা, নিমাইচড়া ও হান্ডিয়াল ইউনিয়ন ও নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় সরেজমিন অনুসন্ধান চালায়। এতে দেখা যায়, গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার শৈলাট ও এর পাশ্ববর্তী

গ্রোমের কৃষিজমিসহ প্রায় ১,২০০ একর জমি একই ব্যক্তির মালিকানাধীন চারটি কোম্পানি অবৈধ পন্থায় দখলের পাঁয়তারা করছে। কক্সবাজারের রামু উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়নের তিনটি মৌজায় অবস্থিত বনবিভাগের ১,৭৮৮ একর জমি সেনানিবাস স্থাপনের জন্য বরাদ্দ প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেনাবাহিনীর স্থাপনা নির্মাণের জন্য পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের ১,৪০৮ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে। এ জমিগুলো চলনবিলের পানির উৎসমুখে অবস্থিত নিম্নভূমির অংশ। সর্বশেষে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চর ক্যারিং মৌজার প্রায় ১০ হাজার একর কৃষিজমি সেনাবাহিনীকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং হাতিয়া, সুবর্ণচর ও চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার অন্তর্গত প্রায় ৩৫ হাজার একর আয়তনের কৃষিজমি বিশিষ্ট জাহাজ্জার চর পুরোটাই সেনাবাহিনীকে বরাদ্দ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। (সংবাদ সম্মেলন, ৮টি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, ১৩ নভেম্বর ২০১৪, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি) অন্যদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমাদিয়া জামাত কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘু যেমন চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, হাজংসহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের জমি-জমা প্রতিদিন দখল হয়ে যাচ্ছে; সংখ্যালঘুদের জমি দখলের জন্য প্রথমত: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর দ্বিতীয়ত: বসতবাড়িতে লুটতরাজ-অগ্নিসংযোগ তৃতীয়ত: উপাসনালয় আক্রমণ এবং চতুর্থত: সংখ্যালঘুদের হুমকি-ধামকি-মামলা দেওয়া হয়; এসবে কাজ না হলে তাদের মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়, যাতে সংখ্যালঘু মানুষদের পক্ষে এলাকায় সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা আর সম্ভব না হয়; এর ফলে হয় তারা হয় অন্যত্র, নয়তো অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হন। সব মিলিয়ে পুরো বাংলাদেশে ভূমি নিয়ে যারপরনাই এক অমানবিক, নিষ্ঠুর আর রক্তাক্ত অধ্যায় প্রতিনিয়ত রচিত হয়ে চলেছে। এর প্রতিকারের জন্য কেউ নেই, নেই কোনো প্রতিবিধান।

৩. ভূমি উচ্ছেদ ও আদিবাসীর মানবাধিকার: বিশ্বজুড়ে ভূমি আদিবাসীদের কাছে পবিত্র। নদী, পাহাড়-পর্বত, ভূমি ও প্রকৃতির সাথে রয়েছে আদিবাসীদের নিবিড় ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। তাদের সংস্কৃতিতে ভূমি হলো জননী – মাদার আর্থ; আদিবাসীরা প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারে – তাই তারা বন ও সম্পদকে কোনোদিন বেচাকেনার বিষয় হিসেবে দেখেনি, জীবনের অংশ হিসেবে দেখেছে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বন, প্রকৃতি সবকিছুকেই বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে দেখে। এখানেই আদিবাসীদের সঙ্গে বর্তমান উন্নয়ন ধারার দ্বান্দ্বিকতা। টাঙ্গাইলের মধুপুর বনে ষাটের দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার জাতীয় উদ্যান গড়ে তুলেছিল আদিবাসী গারোদের ভূমিতে, তাদের উচ্ছেদ করে। কাগজে কলমে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ছিল বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। ভেতরে উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী উচ্ছেদ। আজ এ জাতীয় উদ্যান নির্মানের ষাট বছর পর দেখা যাচ্ছে, মধুপুর বনের প্রাকৃতিক বৃক্ষ উজাড় হয়ে গেছে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসপ্রায়, অরণ্য বিরানভূমিতে পরিণত। আর বনের আদি অধিবাসী গারো ও কোচদের জীবন মুমূর্ষু। বনবিভাগ হাজার হাজার মামলা দিয়ে বনের আদি বাসিন্দাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। সব কিছুই হয়েছে ‘উন্নয়ন’এর নামে। এ সব প্রকল্পের ফলে স্থানীয় মানুষের উন্নয়ন হয়নি, দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা বরং বেড়েছে। অন্যদিকে বাইরে থেকে শত শত মানুষ ঢুকে গেছে একদা আদিবাসী পাহাড়ি অধ্যুষিত এলাকায় ও বনে। আদিবাসীরা পরিণত হয়েছে সংখ্যালঘু, নিজভূমিতে। মধুপুর জাতীয় পার্ক এখন বাইরের আমোদপ্রিয় লোকদের বনভোজন ও আনন্দভ্রমণের যোগ্য জায়গা হয়ে উঠেছে আর আদিবাসীদের কাছে হয়ে উঠেছে বসবাস অযোগ্য। বনের পরিবেশ বিপন্ন, মানুষেরাও বিপন্ন। তাই তথাকথিত উন্নয়নকে আদিবাসীরা ভয় পায়। এভাবেই উন্নয়নের নামে রাষ্ট্র আদিবাসীদের নিপীড়নও ভূমি হারানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। (সঞ্জীব দ্রং, ২০১২) পুরো দেশ জুড়ে আদিবাসীদের ‘আনপিপলিং’ করা হচ্ছে (আবুল বারাকাত ২০১৫); এভাবে চললে বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী মানুষ থাকবে না, সংখ্যালঘু থেকে আদিবাসীরা হয়ে যাবে সংখ্যাশূন্য, তাদেরকে তখন কেবল গবেষণা রিপোর্ট, আর্কাইভ বা প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে পাওয়া যাবে। আদিবাসীরা গরিব/প্রান্তিক কিন্তু যেখানে তারা বাস করেন সেটা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। আর সেটাই আদিবাসীদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দখলবাজদের চোখ পড়ে এখানে, তারা তখন দখলের সব আয়োজন করে চলে। এ যেন আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরি।

৪. সুপারিশ ও করণীয়: প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক কী কারণে আদিবাসীরা ভূমি হারায়? ১৯৪৭-এর দেশভাগের কারণে হিন্দুদের কী অবস্থা হয়েছে, এ নিয়ে যথেষ্ট লেখালিখি ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের জীবনে দেশভাগের ফলে কী ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল, এ নিয়ে খুব একটা কাজ হয়নি। মূলত: ১৯৪৭ ছিল আদিবাসীদের জীবনের বড় টার্নিং পয়েন্ট। পরবর্তীকালে ১৯৬৪ সালের হামলা ও আক্রমণ। দু'পাক্ষিক দাঙ্গা নয়, কেবল একপাক্ষিক হামলা হয়েছিল, আদিবাসীরা শুধু পলায়ন করেছে, দেশান্তরিত হয়েছে। আর ১৯৬৫ সালের মাত্র ১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধে আদিবাসীদের অনেক জমি শত্রু সম্পত্তি হয়ে গেছে। মূলত যেসব কারণে আদিবাসীরা ভূমি হারায় তাহলো পপুলেশন ট্রান্সফার – বার বার বাধ্যতামূলক দেশান্তরকরণ প্রক্রিয়া; ১৯৪৭ সালের পর থেকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, হাজং, কোচ, ডালু, হদি, বানাই প্রভৃতি আদিবাসীদের কয়েকদফা প্রাণরক্ষার জন্য জন্মভূমি ছাড়তে হয়। ১৯৬০-৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের লক্ষাধিক আদিবাসী বাড়ি-ঘর হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়; তখন ৫০ হাজারেরও বেশি আদিবাসী ভারতে, ২০ হাজারের মতো চলে যায় বার্মাতে। ১৯৬৪ সালে পাক সরকার সাম্প্রদায়িক আক্রমণ চালায়। তখন আদিবাসীরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। তাদের ফেলে যাওয়া জমিতে সরকার অ-আদিবাসীদের পুনর্বাসিত করে। যারা ফিরে আসে, তাদের মধ্যেও অনেকে জমি ফেরত পায়নি। ১৯৭১ সালেও পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের সবকিছু ত্যাগ করে দেশান্তরিত হতে হয়। গারো অঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় ১৯৭৫ সালেও গারোদের অনেকে দেশান্তর হয়। বার বার দেশান্তরের ফলে তাদের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। আরো কারণ হচ্ছে আদিবাসীদের কোনো মতামত বা সম্মতি ছাড়াই সেনানিবাস, সেনা ছাউনি, বিজিবি দপ্তর, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের নামে-বেনামে জমি কেনা বা দখল নেওয়া, আদিবাসীদের ভূমিতে ও এলাকায় জাতীয় উদ্যান, এনজিও প্রকল্প গ্রহণ, ইকো-পার্ক নির্মাণ, রাবার বাগান, বাঙালি পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ, অবকাশ কেন্দ্র, সামাজিক বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করা; আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত, ব্যবহৃত ভূমিকে আদিবাসীদের না জানিয়েই রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা বা খাস করে দেয়া; উচ্ছেদ নোটিশ এবং শত শত মিথ্যা মামলা দিয়ে আদিবাসীদের হয়রানি করা; শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি আইন কার্যত বজায় থাকা; ভূমিলোভী চক্রের জাল দলিল, জোরপূর্বক জমি দখল; জমি-জমা সংক্রান্ত আইন কানুন, খারিজ, খাজনা, কাগজপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আদিবাসীদের সচেতনতার অভাব; প্রজাসত্ত্ব আইন বলবৎ থাকার পরও এর যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া এবং জেলা প্রশাসনে কোনো আদিবাসী বিষয়ক অফিসার না থাকা; সরকারি ভূমি অফিসের চরম দুর্নীতি ও আদিবাসীদের প্রতি প্রতিপক্ষমূলক আচরণ; ভূমি জরিপের সময় দুর্নীতি ও ঘুস দিতে বাধ্য করা; ঘুষ না দিলে জমি খাস করে দেয়া; আইনের আশ্রয় না পাওয়া, এমনকি মামলায় জয়ী হলেও জমির দখল বুঝে না পাওয়া; বছরের পর বছর, এমনকি যুগের পর যুগ মামলা চালাতে গিয়ে আরও জমিজমা হারানো, নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হওয়া ইত্যাদি।
এ জন্য যা করণীয় তাহলো পার্বত্য-সমতল নির্বিশেষে সকল আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে তাদের ভাষা-শিল্প-সংস্কৃতি-জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণসহ সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া; আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় শাসন ও ঐতিহ্যগত শাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ সমন্বিত পদক্ষেপ নিশ্চিত করা; আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকারসহ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে জাতীয় সংসদে বিশেষ অধিবেশনে আলোচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময়-নির্দিষ্ট (টাইম-বাউন্ড গোলস) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে দায়িত্ব বণ্টন করা; আদিবাসীদের ভূমি জোরদখলকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া; বনের আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা ও বনবিভাগের হয়রানি মামলা প্রত্যাহার করা; ইকো-পার্কের নামে বন উজাড় বন্ধ করা; সেই সাথে বিশ্বব্যাপী ক্লাইমেট চেঞ্জের ঋণাত্মক প্রভাব থেকে মুক্ত হবার লক্ষ্যে আদিবাসী মানুষ অধ্যুষিত বন-জঙ্গল-জলাভূমি সংরক্ষণে সহায়ক গবেষণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা। আদিবাসীদের প্রথা ও ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দেয়া; আর সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা। (সঞ্জীব দ্রং, ২০১২)

অন্যান্য সুপারিশ ও করণীয়গুলো হলো-

* যেসব জমি শত শত বছর ধরে ঐতিহ্যগত প্রথাগতভাবে আদিবাসীরা ব্যবহার করে আসছে সেইসব জমির প্রথমে চিহ্নিত করা এবং প্রকৃত ভোগ দখলকারী চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করা এবং তাদের নামে বন্দোবস্তের ব্যবস্থার সুপারিশ করা;
* International Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 107 (Convention 107), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ও International Convention on Economic, Social Cultural Right (ICESCR) এর আলোকে আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য আইন প্রণয়ণ করা উচিত;
* অদিবাসীদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে বেগবান করার জন্য দেশের বুদ্ধিজীবী, সিভিল সোসাইটি, এনজিও, প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার তরফ থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;

বাংলাদেশে হাজং, কোচ, বানাই, মারমা, চাকমা, গারো, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, খাসিয়া, মণিপুরী, খুমি, খিয়াং, লুসাই, বম, ম্রো ও রাজবংশীসহ বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করেন। তাঁরা তাঁদের স্বকীয়তা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য দিয়ে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভুলে গেলে ভুল হবে যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ সকল আদিবাসীদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অবদান। নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রেখে আদিবাসী জনগণ যাতে সকলের মত সমান মর্যাদা ভোগ করতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। আমরা মনে করেছিলাম, চল্লিশ বছরে ভূ-রাজনীতির গতিপ্রকৃতি যেমন পাল্টেছে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, মন-রুচিও অনেক অনেক পাল্টেছে, তাই এখন যে সংবিধান রচিত হবে তা কেবল ধর্ম নিরপেক্ষ হলেই চলবে না, একইসঙ্গে ভাষা নিরপেক্ষ, জাতি নিরপেক্ষ, যৌনতা নিরপেক্ষ ও লিঙ্গ নিরপেক্ষ হতে হবে। ভুলে গেলে ভুল হবে যে, বাঙালির একক জাতীয়তাবাদের দেমাগ ইতঃপূর্বে রাষ্ট্রীয় শান্তির ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যাই কেবল পয়দা করেছে, কোনো সমাধান বাতলাতে পারেনি। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এরকম ধারণা কাজ করে যে একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলতে না পারলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জোরদার হয় না। আমরা মনে করি একক জাতীয়তাবাদের প্রাবল্য একটি ভুল প্রেমিজ; বরং একটি দেশের জনবিন্যাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও কৃষ্টির বহুমুখী বিচিত্র রূপই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে; এটিই বৈচিত্র্যের ঐকতান বা বহুত্ববাদ – বিউটি অব ডেমোক্রেসি। একক জাতিসুলভ দাম্ভিকতা বাদ দিয়ে দ্রুত এই সত্য বুঝতে পারলে রাষ্ট্রের জন্য বরং ভালো যে, বাংলাদেশ কোনো এক জাতি এক ভাষা আর এক ধর্মের রাষ্ট্র নয়; এটি অবশ্যই একটি বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু ধর্মের রাষ্ট্র; সেই আশায় আমাদের দাবিসমূহ আবারো তুলে ধরছি:

* আইএলও-এর ১০৭ ও ১৬৯ নং কনভেনশন এবং ২০০৭ সালে গৃহীত জাতিসংঘ আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র মোতাবেক আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।
* সংবিধান সংশোধন করে আদিবাসী অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারসহ ভূমি ও সম্পদের উপর অধিকার নিশ্চিত করা;
* আদিবাসীদের প্রথা ও ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দেয়া;
* সমতলের আদিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র ভূমি কমিশন গঠন ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা;

* জাতীয় আদিবাসী কমিশন গঠন করা;
* আদিবাসী অধিকার আইন প্রণয়ন করা;
* উন্নয়নের নামে ভূমি দখল বন্ধ করা;
* আদিবাসীদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা;

আমারা এখনও মনে করি বাংলাদেশ একটি বহু জাতির সম্মানজনক অংশীদারিত্বের রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হওয়ার স্বপ্নকে ধারণ করতে সক্ষম হবে। আমরা চাই দেশে বসবাসকারী সকল জাতির সমান মর্যাদার ভিত্তিতে নতুন করে রচিত হোক আগামীর সংবিধান।

তথ্যসূত্র:

* সঞ্জীব দ্রং ২০১২, আদিবাসী দিবস উপলক্ষে সিরডাপ মিলনায়তনে পঠিত, ৭ আগস্ট ২০১২
* তথ্যপত্র: পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি, ২০১১
* আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র, ২০১১
* সঞ্জীব দ্রং ২০১৪, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আদিবাসী ফোরাম যৌথ আয়োজিত ন্যাশনাল সেমিনারে উপস্থাপিত, সিরডাপ, ২৭ মে ২০১৪
* ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজিনাস অ্যাফেয়ার্স-এর সূত্রে উদ্ধৃত, সংহতি ২০১১, পৃষ্ঠা ২৩
* ঘোষণাপত্র, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০১২
* রোবায়েত ফেরদৌস ২০১১, 'সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী: আদিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বাঙালি জাতীয়তাবাদ', সংহতি, ২০১১, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা ০৯ আগস্ট ২০১১
* আবুল বারাকাত, "পলিটিক্যাল ইকোনমি অব আনপিপলিং অব ইন্ডিজিনাস পিপলস: দ্য কেইস অব বাংলাদেশ", বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মেলন, জানুয়ারি, ২০১৫
* রোবায়েত ফেরদৌস ২০১৩, গণমাধ্যম ও আদিবাসী, গতিধারা, ঢাকা, আগস্ট ২০১৩
* নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৪ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
* সংবাদ সম্মেলন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, ১ ডিসেম্বর ২০১৪
* সংবাদ সম্মেলন, ৮টি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, ১৩ নভেম্বর ২০১৪, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি
* পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা ও পাহাড়িদের অধিকার, আগস্ট, ২০১০, এএলআরডি

রোবায়েত ফেরদৌস: মানবাধিকার কর্মী; অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
robaet.ferdous@gmail.com

উত্তরবঙ্গ কথন

বাংলাদেশের প্রান্ত উত্তরের গিরিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে ক্রম দক্ষিণে ত্রিস্রোতা বিধৌত এক বিস্তীর্ন ভূ-ভাগ যার দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র; ইতিহাসে কখনো প্রাগ্‌জ্যোতিষ, লৌহিত্য, কামরূপ, কামতাপুর পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্রী বা উত্তরকুল ইত্যাদি নামে উদ্ভাসিত। বাংলার প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ পুন্ড্রবর্ধন। বরেন্দ্রীর ভৌগোলিক পরিচয় হচ্ছে পশ্চিমে গঙ্গা এবং পূর্বে করতোয়া-এর মধ্যবর্তী বিশাল ভূখন্ড। পুন্ড্রবর্ধনের ভৌগোলিক সীমা আর বরেন্দ্রীর সীমা একই, তবে বরেন্দ্রী আরও কিছুটা বিস্তৃত। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে 'উত্তরকূলের' উল্লেখ রয়েছে। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা বাংলার সুবেদার থাকাকালীন (১৬৪৯-৫৮) কুচবিহার রাজ্যের কিছু অংশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। তিনি রাজস্ব বিষয়ক এক জমাবন্দী কাগজ প্রস্তুত করেন ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। নতুন জমাবন্দী মোতাবেক সমগ্র বঙ্গদেশ ৩৪টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন যার মধ্যে আলোচ্য 'উত্তরকূল' নামক ভূখন্ডে একটি নতুন সরকার গঠিত হয়েছিল এবং এর বাৎসরিক জমার পরিমাণ ছিল ৩১,৪৫১ টাকা। সরকার উত্তরকুল বা কামরূপের অবস্থান ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর এবং পশ্চিমে। ভুটান পর্বতের পাদদেশ ছিল উত্তরের সীমা এবং পূর্বদিকে অহম রাজ্যের সীমা। উত্তরকুল মোট তিনটি পরগনা নিয়ে গঠিত।১

১৯০১ সালের গণশুমারি প্রতিবেদনে প্রথম 'উত্তরবঙ্গ' বা 'North Bengal' শব্দটির সাথে পরিচয় ঘটে। এই গণশুমারিতে তৎকালীন বাংলাকে মোট আটটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়-যার অন্যতম North Bengal বা 'উত্তরবঙ্গ' সেখানে শুধু নর্থ-বেঙ্গল নয়, ওয়েস্ট-বেঙ্গল এবং ইস্ট-বেঙ্গল শব্দ দুটিও ১৯০১ সালের এই আদমশুমারির প্রতিবেদনে প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। সেই প্রতিবেদনে উত্তরবঙ্গ বলতে তৎকালীন রাজশাহী বিভাগ, মালদহ, কোচবিহার ও সিকিমকে বোঝানো হয়েছে। যদিও মাঝে মাঝে সীমা পরিবর্তন হয়েছে।
'১৮২৮ সালে যখন রাজশাহী বিভাগ তৈরি হয়েছিল তখন মাত্র ৪ টি জেলা ছিল- রাজশাহী, মালদা, রংপুর ও দিনাজপুর। ১৮১৩ সালে মালদহ জেলা তৈরি হয়। ১৮৩২ সালে পাবনা জেলা, ১৮৩৬ সালে বগুড়া জেলা এবং ১৮৫০ সালে দার্জিলিং জেলা। সিপাহী বিদ্রোহের পরে একটি মাত্র জেলা তৈরি হয়েছিল-জলপাইগুড়ি জেলা-১৮৬৯ সালে। এই আটটি জেলা - রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, বগুড়া, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি এবং দেশীয় রাজ্য কোচবিহার নিয়েই রাজশাহী বিভাগ ১৯৪৭ সাল অবধি টিকে ছিল ২। সাতচল্লিশ সালের দেশ বিভাগে বাংলা ভাগের সাথে সাথে উত্তরবঙ্গও বিভক্ত হয়ে যায়। পরিবর্তিত হয়ে যায় রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক সীমারেখা। ইতোমধ্যে প্রশাসনিক কারণে রাজশাহী বিভাগ ভেঙ্গে গঠিত হয়েছে নবতর 'রংপুর বিভাগ'। যাইহোক, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অনুষঙ্গ ঐতিহাসিক উত্তরবঙ্গ এবং এর প্রান্তিক জনের সংগ্রামের ইতিহাস। যদিও মানুষের সামাজিক জীবনে সংগ্রামের ইতিহাস কখনো সময় ও ভৌগোলিক রেখায় সীমাবদ্ধ থাকে না।

বাংলাদেশে উত্তর বঙ্গের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। সেইসঙ্গে এর বিচিত্র ভূমিস্তর, বহু জনজাতির সম্মিলিত জীবনধারা এবং বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই ভূভাগের প্রধান সম্পদ। সমিত ঘোষের ভাষায়- 'উত্তরবঙ্গের সমগ্র ভু-ভাগ অত্যন্ত প্রাচীন। এখানকার জনজীবন ও ভৌগোলিক রূপরেখা বৈচিত্র্যপুর্ণ। এখানে পাহাড়, সমতল, অরণ্য, শষ্যক্ষেত্র, মানুষের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সুন্দর সমাহার দেখা যায়। এখানে মানুষের জীবনে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রাচীনকাল থেকেই উত্তরবঙ্গে নানা জনজাতি, উপজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দখল করে আছে

বাঙালি, অবাঙালি বর্ণহিন্দু ও মুসলমান। পরস্পরের উপর তাদের ধর্মীয় ভাষা ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়েছে। তার একদিকে আছে আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, অপরদিকে আছে অবিমিশ্র জনজাতির দীর্ঘকালাশ্রিত সংস্কার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপ।৩ এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফাঁদে দীর্ঘকাল শোষিত ও নিপীড়িত হতে হতে আলাভোলা এই সরল মানুষগুলো এক সময় বেঁকে বসে, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে- জীবন সংগ্রামে সম্মিলিত যুদ্ধে জ্বলে ওঠে। মানব সভ্যতার প্রগতির ইতিহাস মানেই এই সংগ্রামের ইতিহাস। উত্তরবঙ্গের জনজাতি তথা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম ও বিদ্রোহের ইতিহাসও তাই আমাদের সামাজিক ইতিহাসেরই অংশ।

২. বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী

বহু বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলাসহ উত্তরবঙ্গ (সাবেক রাজশাহী বিভাগ), বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ এবং পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলায় প্রায় ত্রিশলক্ষ আদিবাসী তথা নৃতাত্ত্বিক জনজাতি বসবাস করে। প্রায় ত্রিশটি ভাষা ব্যবহারকারী মোট ৪৫টি (মতান্তরে ৭৩টি)৪ আদিবাসী জাতিসত্তার রয়েছে পৃথক পৃথক জীবনধারা ও গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ‘বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২% হচ্ছে অবাঙালি। ব্র্যাকের এক গবেষণায় (২০০৬) দেখানো হয়েছে, দেশের জনসংখ্যার ১.৫% হচ্ছে আদিবাসী, সেই হিসাবে এ দেশে আদিবাসীদের সংখ্যা ২৫-৩০ লক্ষ ৫। তারাও এদেশের নাগরিক, কিন্তু পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে তাদের কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। দেশের মূলধারার উন্নয়ন থেকে তারা অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। জন্মের পর থেকেই তারা হয়ে যায় উন্মুল উদ্বাস্তু, নিজভূমে পরবাসী।

আদিবাসী ওয়ার্ল্ড কাউন্সিলের সংজ্ঞা মতে “আদিবাসী উপজাতি জনগোষ্ঠী বলতে এমন সব জনগোষ্ঠী বোঝায়, যারা প্রাচীনকাল হতে তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে পাওয়া ভুমিতে উত্তরাধিকার সুত্রে বসবাস করে আসছে। যারা নিজেদের সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় রক্ষণশীল। যাদের নিজস্ব ভাষা ও অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক বলে চিহ্নিত করেছে”।

ভূমিই আদিবাসীদের জীবনে সবচেয়ে প্রিয় ও পবিত্র উপাদান। কিন্তু সংখ্যাগুরু সমাজের কতিপয় স্বার্থান্ধ মানুষের লোভের আগুনে পুড়ে তারা দিনে দিনে পরিণত হচ্ছে ভূমির অধিকার বঞ্চিত সর্বহারা দিনমজুরে। এই বিশাল ভূভাগে কোথাও তাদের কোন দাঁড়াবার জায়গা নেই। অথচ সভ্যতার উষালগ্নে একদিন সবকিছুই ছিল তাদের দখলে। একদিন তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল সীমাহীন উদার আকাশ, সমুদ্র-নদী, ছায়াঘন অরণ্য আর দিগন্তের হাতছানি নীরব পাহাড়। আদিবাসী অন্তঃপ্রাণ উপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায়-‘একসময়ে বন ছিল, পাহাড় ছিল, নদী ছিল, আমরা ছিলাম। আমাদের গ্রাম ছিল, ঘর ছিল, জমি ছিল, আমরা ছিলাম। আমাদের ক্ষেতে আবাদ হতো ধান, কোদো, কুটকি, সোমা, আমরা ছিলাম। মানুষ বেড়ে যেত, সংসার বেড়ে যেত, আমরা কিছু মানুষ চলে যেতাম দূরে। পৃথিবীর কাছে বলে নিতাম, ঘর বাঁধতে খুঁটি পুঁতছি। চাষ করবো তাই জমি হাসিল করবো। সেইখানে বেঁধে নিতাম ঘর, গড়ে নিতাম গ্রাম, যে যার মতো জমি হাসিল করতাম। তখন আমরা ছিলাম, শুধু আমরা ছিলাম’। ‘টেরোড্যাকটিল, পুরণসহায় ও পিরথা’ উপন্যাসের এই বর্ণনায় যেন একদা দূর অতীতে আদিবাসীদের যাপিত জীবনের অনুভব গহীনের অস্তিত্ব চেতনায় এক অজানা প্রান্ত থেকে ভেসে আসা তপ্ত নিশ্বাসে শতাব্দ প্রাচীন বেদনার ঘূর্ণি বর্তমানের পাথুরে বাস্তবতায় নানান বিন্যাসে ঘুরপাক খায়; তারই এক বিষাদঘন ধূসরচিত্র মায়া স্নিগ্ধ দরদী হাতের ছোঁয়ায় অন্যরকম প্রাণ ও পূর্ণতা পেয়েছে।

পৃথিবীতে প্রায় পাঁচ হাজার আদিবাসী সম্প্রদায় আছে বলে ধারণা করা হয়। তাদের সংখ্যা ৩৭ কোটি। বাংলাদেশসহ ৭০টি দেশে তাদের বসবাস। গোষ্ঠীবদ্ধ সকল জাতি এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, আর সেই সংস্কৃতির প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তাদের মুখের উচ্চারিত ভাষা। প্রত্যেক জাতির অধিকার আছে তাদের নিজস্ব ভাষার চর্চা ও তা সংরক্ষণের। কিন্তু রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু জাতির আগ্রাসনে ক্ষুদ্র জাতি সত্তাগুলির ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। এখনো পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ভাষা জীবিত আছে। এই

ভাষাগুলির মধ্যে তিন হাজার ভাষাই প্রধান ভাষার চাপে হারিয়ে যাচ্ছে। গড়ে প্রতি দু-সপ্তাহে একটি করে অপ্রধান ভাষা লোপ পাচ্ছে। আর একটি ভাষা পৃথিবী থেকে লোপ পাওয়ার অর্থ হলো মানুষের ঐশ্বর্যমন্ডিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আংশিকভাবে বিলুপ্ত হওয়া'৬।

অনুমান করা হয় যে, সারা বিশ্বে এমন ৫০০ ভাষা রয়েছে যে সব ভাষার প্রতিটিতে ১০০ জনের কম মানুষ কথা বলেন। স্রেফ একজন ব্যবহার করেন এমন ভাষা রয়েছে প্রায় ৫০টি। ২০১৩ সালে 'লিভোনীয়' ভাষার শেষ ব্যবহারকারী লাটভিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। এমনই আর একটি ঘটনা ঘটে ১৯৯৮ সালের ১০জুন অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের ক্রক দ্বীপে একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরিত হলে। ঐ মাইন বিস্ফোরণে তুয়োনে উদাইনা নামের এক ভদ্রলোক, একমাত্র যিনি 'ডালমেশীয়' ভাষায় কথা বলতেন-তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ডালমেশীয় ভাষার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশে নৃতাত্ত্বিক সংখালঘু বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসাবে আদিবাসী সম্প্রদায়কে কখনো উপজাতি, আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা ইনডিজেনাস পিপল ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এই জনগোষ্ঠী 'আদিবাসী' হিসেবে পরিচিত হতে অধিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও অন্যান্য আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলো সেই অর্থে 'আদিবাসী' শব্দটিই ব্যবহার করে থাকে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে ২০১০ সালের ২৩নং আইনে এদেশে বসবসকারী এ ধরনের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই আইনকে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০' নামে অভিহিত করা হয়েছে, যা ১২ এপ্রিল ২০১০ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত। এই আইনের ধারাবাহিকতায় গত ২৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটে সরকার কৃষক সর্বমোট ৫০টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এর প্রতিস্থাপিত তফসিলে। উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালে প্রকাশিত প্রথম গেজেটের তফশীলে নৃগোষ্ঠীদের সংখ্যা ছিল-২৭টি। উক্ত আইনের সংজ্ঞায়-'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অর্থ তফসিলে উল্লিখিত বিভিন্ন আদিবাসী তথা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও শ্রেণির জনগণ' বলা হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' ও 'আদিবাসী' শব্দ দুটি সমার্থক শব্দ হিসেবেই উল্লেখ দেখা যায়।

বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসীদের কৌম বা জাতিসত্তাগত সংখ্যা, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, লোকগাথা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত পরিসংখ্যান এবং প্রকৃত ইতিহাস আহরণে এখনো অনেক অপূর্ণতা রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আরও গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সক্রিয় পদক্ষেপ এবং আন্তরিক উদ্যোগ অপরিহার্য। এছাড়া আদিবাসীদের প্রান্তিকতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অর্থনৈতিক ও সামিজক শৈথিল্য, সমাজ কাঠামোর ভিতরে শ্রেণিগত সমতার সংকট এবং সাংস্কৃতিক সংকট বিশ্লেষণ ও নিরসনে গভীর দৃষ্টি ও মনোযোগের অপেক্ষা রাখে।

৩. উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজ

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঠিক কবে থেকে পুন্ড্র-বরেন্দ্র অঞ্চলে (উত্তরবঙ্গ) মানব জাতির চলাচল ও বসবাস শুরু হয়েছিল তার সঠিক হিসাব মেলানো অসম্ভব। নৃ-বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ বা এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেটুকু দিশা দিয়ে গেছেন তার প্রায় অধিকাংশটাই অনুমান নির্ভর। তবু এক্ষেত্রে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। আব্দুর রহমান সিদ্দিকীর মতে সম্ভবত এক হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে বরেন্দ্র অঞ্চলে স্থায়ী মানব বসতি গড়ে উঠতে শুরু করে। অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ তাদের যাযাবর শিকারি ও সংগ্রাহক জীবনধারা পরিত্যাগ করে স্থিতিশীল জীবন ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ক্রমশ স্থায়ী গ্রামীন জীবনধারার বিকাশ ঘটে, গোড়া পত্তন হয় সমৃদ্ধ কৃষি সমাজের ৮। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসের রুদ্ধপ্রায় গবাক্ষপথে যে ক্ষীণ তথ্যালোকরশ্মি আধুনিককালের আঙ্গিনায় এসে পড়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, আদি বরেন্দ্রভূমিতে পোদ, শবর, কৈবর্ত, কোচ, মেচ, রাজবংশী প্রভৃতি ছোট বড় আদি জাতিগোষ্ঠী এবং হয়তো আরও অনেক অজ্ঞাত বিলুপ্ত

মানবকুল বিচরণ করে বেড়াত। এইসব অরণ্যচারী, যাযাবর গোষ্ঠীর অনেকে তাদের জীবনধারা পরিবর্তন করে কৃষিভিত্তিক স্থায়ী জীবন যাপন প্রণালী অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছিল।৯

পণ্ডিতগণ ধারণা পোষণ করেন যে, সম্ভবত দশ হাজার বছর পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ড বা তার নিকটবর্তী বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চল থেকে অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর কতিপয় বিচ্ছিন্ন শাখা প্রশাখার মানুষ ক্রমশ এশীয় ভূখন্ডের দিকে প্রবেশ করতে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে অস্ট্রেলিয়ার মুল ভূ-খন্ডের স্থল সংযোগ এর বহু পুর্বেই ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই উভয় মহাদেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী ভূ-খন্ডটি সমুদ্র তলদেশে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এই কারণে অস্ট্রেলিয়া ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলসমুহের বহু সংখ্যক আদিম মানুষ কোনও অজ্ঞাত কারণে জলপথেই দলে দলে এশিয়া ভূখণ্ডের দিকে পাড়ি জমাতে থাকে। এক সময় এরা ইন্দোনেশিয়া, শ্যামদেশ (থাইল্যান্ড) ও আসাম উপত্যকা হয়ে ভরতবর্ষের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে।
আবার কতিপয় ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানী মনে করেন যে, অস্ট্রেলিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিক থেকে দুটি চালানে অস্ট্রালয়েড ধারার মানুষেরা এদিকে এসেছিল। সমুদ্রপথে আগত প্রথম চালানটির কয়েক সহস্র বছর পর দ্বিতীয় চালানটি আনুমানিক চার হাজার খ্রিষ্ট পুর্বাব্দের দিকে বৃহত্তর বাংলা ও তার আশে পাশের অঞ্চলে এসে পৌঁছাতে থাকে। এরাই এ অঞ্চলে মুন্ডারি ভাষা সংস্কৃতির মূল স্রষ্টা-যা পরে তাদের পূর্বসুরি প্রথম চালানের মানুষের মধ্যেও পরিব্যপ্ত হয়েছিল। সম্ভবত তাদেরই একাংশ মধ্য ও পূর্ব-মধ্য ভারতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। হয়ত এদের মধ্যে কতিপয় জনগোষ্ঠী উত্তরে ও পশ্চিমের সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

যে কোন কারণেই হোক মহেঞ্জদারো-হরপ্পার বিলুপ্তির পর এবং উত্তর ভারতে আর্য ভাষা-ভাষীদের বসতি স্থাপনের সমসাময়িককালে প্রটো-অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর কতিপয় শাখা প্রশাখার মানুষ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বনবাদাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর এদের মধ্য হতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিচরণকারী প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের একাংশ পরবর্তীকাল তাদের অর্ন্তর্নিহিত পরিভ্রমণশীল প্রবৃত্তির জন্য কিংবা কোন পূর্বাভিমুখী চাপের মুখে স্থানান্তর করতে থাকে এবং অবশেষে আদি বরেন্দ্রভূমি ও এর আশেপাশের অঞ্চলে এসে উপনীত হয়-এরাই সম্ভবত পরবর্তীকালের কোল, মুন্ডা, সাঁওতাল, পোদ, শবর, খেরওয়ারি, জুয়াং প্রভৃতি নামে পরিচিত উপজাতিগুলির আদি পূর্ব পুরুষ ছিল।১০

এছাড়াও বরেন্দ্র অঞ্চলে আদিকাল থেকে বসবাসকারী আরও কতিপয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন-ভুঁইয়া, হাঁড়ি, ডোম, পুলিন্দ, বাউড়ি, নিষাদ প্রভৃতি। এইসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা কম হলেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও এদের বসবাস রয়েছে। কিন্তু এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনায় এইসব জনজাতির নাম সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয় না। যেমন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত এবং মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত “আদিবাসী জনগোষ্ঠী” (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫) বইয়ের সূচিপত্রে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের ১৫টি আদিবাসীর তালিকা উপস্থাপিত হয়েছে, যার মধ্যে এ অঞ্চলে বসবাসকারী হাড়ি, ডোম এইরূপ বেশকিছু জনজাতি গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ নেই। আবার উৎস প্রকাশন, ঢাকা,(বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলন) কর্তৃক প্রকাশিত এবং মেজবাহ কামাল কর্তৃক সম্পাদিত বাংলাদেশের আদিবাসী (এথনোগ্রাফিয় গবেষণা) তৃতীয় খন্ডে উত্তর অঞ্চলের আদিবাসীদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ২২টি (সূচিপত্র), যার মধ্যেও এদের অস্তিত্ব নেই। উত্তরবঙ্গে বর্তমানে বসবাসকারী আদিবাসীদের প্রকৃত সংখ্যা কত এবং তারা কারা এখনো তাদের পরিচয় সুনির্দিষ্ট নয় বলেই দেখা যায়।

অন্যদিকে এইসব তালিকা এবং আলোচনায় অন্যান্যদের সাথে রাজবংশীদের উপজাতি বা আদিবাসী হিসাবে দেখানো হলেও উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা নিজেদের ‘ক্ষত্রিয়’ তথা ‘রাজবংশী ক্ষত্রিয়’ বলে দাবী করে এবং তারা আদিবাসী বলে কখনোই নিজেদের পরিচয় দেয় না। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক

প্রকাশিত তালিকায় রাজবংশীরা তফশিলি জাতি হিসেবে স্বীকৃত। আরও লক্ষণীয় যে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত আলোচ্য 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী' বইয়ে 'রাজবংশী' বিষয়ের প্রবন্ধকার সুভাষ জেংচাম বেশ কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেছেন যা বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই দেখা যায়। যেমন তিনি এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, 'রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় এবং শেরপুর জেলার কয়েকটি এলাকায় রাজবংশীদের বসবাস। তাদের অধিকাংশ লোক পশ্চিবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় বসবাস করেন। বাংলাদেশে এদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের মত' (পৃষ্ঠা-২৯৮)। এরা কোন রাজবংশী? যদি তারা রাজবংশী ক্ষত্রিয় হয়ে থাকে তাহলে উত্তরবঙ্গের রংপুরের চাইতে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় এদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাছাড়া বাংলাদেশে অনেক রাজবংশীর বসবাস রয়েছে জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলায়। অপরদিকে পশ্চিম বঙ্গে কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার বাইরে দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় এদের অধিক সংখ্যায় বসবাস।

রংপুর জেলা গেজেটিয়ার (১৯৯০) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জে,এ,ভাস তাঁর প্রকাশিত গেজেটিয়ারে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'এ জেলায় (রংপুর) হিন্দু জনগোষ্ঠীর দুই তৃতীয়াংশই রাজবংশী এবং নিজেদের তারা আর্যাবর্ত থেকে আগত ভঙ্গক্ষত্রিয়দের উত্তর পুরুষ বলে দাবি করে'। এই জেলা গেজেটিয়ারে বর্ণিত ১৯৮১ সালের জনশুমারিতে ধর্মভিত্তিক পরিসংখ্যানে বৃহত্তর রংপুরের হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৭,৫৫,১৭০ জন, সেই হিসেবে জেলায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সংংখ্যা দাঁড়ায় = ৫,০৩,৪৪৬ জন। ১৮৭২ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী রংপুর জেলা রাজবংশীদের সংখ্যা ছিল ৩,৯৯,৪০৭ জন। অথচ ১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে রংপুরে মোট আদিবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮,২০০ জন এবং ১৯৬১ সালে শুমারিতে এই সংখ্যা ছিল ৪২৯২ জন। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, নিশ্চয় রাজবংশীদের এই আদিবাসী পরিসংখ্যানের বাইরে রাখা হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য 'রাজবংশী' প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য ও পরিসংখ্যানের গ্রহণযোগ্যতাসহ অন্যান্য আদিবাসীদের উপর এ যাবত প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এবং গবষেণার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিও আমাদের ভাবিত করে।

বরেন্দ্রভূমিতে সর্বশেষ এবং ক্ষীণতম স্রোতধারাটি এসে পৌঁছায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে এই অর্ধশতাব্দীব্যাপী সময়কালে পূর্ব-মধ্য ভারতের নানা অঞ্চল হতে পর্বত ও অরণ্যচারী কয়েকটি আদিম যাযাবর জনগোষ্ঠী এদিকে আগমন করে। এরা প্রধানত নির্মাণকর্মী ও মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে এদিকে আগমন করতে শুরু করেছিল। এইসব বহিরাগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, ওরাঁও, মুন্ডা, হো, কোল, মালপাহাড়ী মাহালী প্রভৃতি। বরেন্দ্র অঞ্চলে অভিবাসনের পূর্বে এরা গভীর অরণ্যঘেরা রাজমহলের পাহাড়ে, ছোটনাগপুর, পালামৌ, দামন-ই-কোহ তথা সাঁওতাল পরগনার দুরধিগম্য স্থানে বাস করত। ব্রিটিশ শাসন আমলে বাংলার এই অঞ্চল সমূহে নতুন রেলপথ স্থাপন, সড়ক নির্মাণ, চা বাগান রচনা, হালচাষ প্রভৃতি কাজে তারা এদিকে আসতে থাকে। এছাড়া রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া, দিনাজপুর অঞ্চলের বড় বড় ভূ-স্বামী জমিদারগণ বনজঙ্গল বিনাশ করে কৃষি জমি উদ্ধারের কাজে শুকনো মৌসুমে তাদের শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসতেন। এই সব শ্রমিকদের অনেকেই তাদের মূল বাসস্থানে ফিরে গেলেও কিছু লোক আস্তে আস্তে এই অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। 'এখন বরেন্দ্রে যে সাঁওতাল, ওরাঁও, মুন্ডারা বাস করে তারা ঐসব মৌসুমি শ্রমিকদের তৃতীয় অথবা চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ' ১৮। 'এই আদিবাসী গোষ্ঠীর সাধারণ দেহ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেহত্বক বর্ণ গাঢ় বাদামী থেকে কালো, মাথা লম্বা, নাক মোটা ও চ্যাপ্টা, নাসামূল সামান্য অবনত। দেহের উচ্চতা মাঝারি। ঢেউ খেলানো চুল-কোন কোন চুলে দেখা যায় সামান্য কুঞ্চন। ঠোঁট কখনো মাঝারি, কখনো মোটা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে দেহগড়ন সুগঠিত। উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ওঁরাও ও মালপাহাড়ী গোষ্ঠীদ্বয়কে মানব বিজ্ঞানী ম্যালোনী দ্রাবিড় ভাষী বলে উল্লেখ করেন। এদের তিনি অস্ট্রিকদের (সাঁওতাল) মতো পূর্ব গোলার্ধের অধিবাসী মনে করেন না' ১৯। 'অপরদিকে এদের মধ্যে

সাঁওতাল, মুন্ডা হো ও মাহালীরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের কোল- মুন্ডারী ভাষা-ভাষী মানুষ। তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যে যেমন প্রোটো-অস্ট্রালয়েড সুলভ অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তেমনি এরা অস্টিক সংস্কৃতির বাহকও বটে' ২০।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহী বিভাগের ৭টি জেলায় (রাজশাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও মালদহ) আদিবাসী জনসংখ্যা প্রদর্শন করা হয়েছে - ৬,৩৫,৪২৮ জন। দেশবিভাগ পরবর্তীকালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত গণশুমারিতে রাজশাহী বিভাগের মোট ৫টি জেলায় (রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা) আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৬,৯৪১ জন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ আমলে ১৯৯৫ সালে সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর প্রফুল্লচন্দ্র সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত এবং উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত এক পরিসংখ্যানে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের (সাঁওতাল, ওঁরাও, পাহাড়ীয়া ও মাহালী) সংখ্যা প্রদর্শন করা হয়েছে -২,৬৫,৯১৬জন ২১। প্রকৃত অর্থে বর্তমান উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে মোট কতটি আদিবাসী জনজাতি বসবাস করে এবং তাদের সংখ্যা কত, তাদের জীবনধারা, সংস্কৃতি ও ভাষার বর্তমান হালচাল কী, সে সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। এই সময়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনের নানান উত্থান-পতনে, ত্যাগে, সাহসে-সংগ্রামে ও উন্নয়নে এইসব জনগোষ্ঠীর যে অবদান তার পৃথক মূল্যায়নও আমাদের কর্তব্যবোধের মধ্যে উচ্চকিত হওয়া অপরিহার্য।

৪. উত্তরবঙ্গে কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট

সমগ্র বঙ্গের ইতিহাসে আদি অগ্নিগর্ভের নাম উত্তরবঙ্গ। স্মরণযোগ্য ইতিহাসের আওতায় দূর অতীতের কৈবর্ত বিদ্রোহ প্রকৃত অর্থে ছিল 'কৃষক বিদ্রোহ'। কারণ কৈবর্তরা ততদিনে জলজপ্রাণি আহরণের পেশা পরিত্যাগ করে অধিকাংশই কৃষি জীবনকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিল। সম্ভবত এই বিদ্রোহই ছিল এযাবৎ বৃহৎ বঙ্গের ইতিহাসে জানা প্রথম কৃষক বিদ্রোহ। কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' এবং সেই সময়ের প্রাপ্ত প্রস্তরাদিতে উল্লেখ আছে যে দিব্য মহীপালের কাছ থেকে বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ) দখল করে নেন এবং মহীপাল এই বিদ্রোহের সময় লড়াইয়ে প্রাণ হারান ২২।

কৈবর্তদের জাত এবং পেশা নিয়েও অনেক বিতর্ক রয়েছে। তারা কি কৃষক ছিলেন এবং এই বিদ্রোহ কি কৃষক বিদ্রোহ? এ ব্যাপারে স্বামী ধর্মানন্দ মহাভারতীর 'সিদ্ধান্ত সমুদ্র' পুস্তকে উদ্ধৃত রিজলি সাহেবের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য; তিনি লিখেছেন, 'কৈবর্তদিগের প্রাচীন প্রভূত্ব, রাজত্ব, বিক্রম, বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রকৃষ্টরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কৃষিকার্যই তাহাদের সর্বশ্রেষ্ট জীবিকা' ২৩। কৈবর্তরা ছিল মৎসজীবী এবং কৃষক। একটি উপজাতি হিসেবে কৈবর্তদেরকে ব্রাহ্মণ সমাজে নিম্ন মিশ্রবর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়। ঋষি মনুর মতে কৈবর্তরা ছিল মাঝি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এদের বেশিরভাগই কৃষক, অনেকে এদেরকে মাহিষ্য বলেও উল্লেখ করেছেন' ২৪। কিছু কৈবর্ত প্রধানদের পাল রাজারা জমি ভোগ করার জন্য দিয়েছিল। কিন্তু দশম শতাব্দীতে মহীপাল ঐ জমিজমা পুনরধিকার করে নেয়। এর ফলে কৈবর্তরা করের বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। ফলে স্বভাবতই তারা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পালদেরকে সমুলে উৎপাটন করার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হয় ২৫। কৈবর্ত জাতি সম্পর্কে সমিত ঘোষ আরও বলেন 'কৈবর্তরা সেই উপজাতি কৃষক যারা জাতি ধারণা বা ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত হয়েছে। কৈবর্তরা ছিল হিংস্র উপজাতি। পালদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা কোন রথ ব্যবহার করেনি। অন্যদিকে তারা মোষের পিঠে চড়ে তির ও ধনুক নিয়ে লড়াই করেছে ২৬।

এরপর ইতিহাসের দীর্ঘ নীরবতার পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে যে সকল আন্দোলন সংঘঠিত হয়েছিল আপাত দৃষ্টিতে তা বিকাশমান ঔপনিবেশক রাষ্ট্র কাঠামো ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হলেও এই

আন্দোলনের গোড়ার শক্তি ছিল এ অঞ্চলের কৃষক সমাজ। 'যদিও প্রায় সবগুলো প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ ছিল বিচ্ছিন্ন এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত, কেননা কোন ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তার উদ্ভব ও বিকাশ এসময়ে বা এর আগে ঘটেনি'২৭।

ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাংলা তথা ভারতবর্ষের কৃষক ও কারিগরদের বিদ্রোহ প্রথম আরম্ভ হয় ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে। এই সব বিদ্রোহের পেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায় বলেন, 'মোগল শাসনের মধ্যভাগ হইতেই বিহার ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বহু সন্নাসী ও ফকিরের দল স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তাহারা কালক্রমে রীতিমত কৃষকে পরিণত হয়। সন্ন্যাসীদের একটা বড় দল ময়মনসিংহ ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় বসবাস করিতে থাকে। ইহারা প্রধানত "গিরি" সম্প্রদায়ভুক্ত ফকিরদের একটা দল বাস করিতে থাকে উত্তরবঙ্গে। ইহারা প্রধানত 'মাদারী' সম্প্রদায়ের ফকির। উত্তরবঙ্গে ইহাদের বহু দরগা ও তীর্থক্ষেত্র থাকায় ইহারা প্রধানত উত্তরবঙ্গেই ভীড় করে। এই সকল সন্ন্যাসী ও ফকির চাষাবাদের মারফত রীতিমত কৃষকে পরিণত হয় এবং ইংরেজ শাসনের প্রথম হইতেই কৃষক হিসেবে ইহারাও ইংরেজ বণিকরাজের শোষণের শিকার হইয়া উঠে। ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতের কোন শাসকই এই সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দলবদ্ধ তীর্থ ভ্রমণে বাধা দেয় নাই। কিন্তু বাংলা ও বিহারের ইংরেজ শাসকগণ ইহাদের তীর্থ ভ্রমণকেও শোষণের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পরিণত করে। শাসকগণ তীর্থ যাত্রীদের মাথাপপিছু বিভিন্ন প্রকার কর ধার্য করিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ লুটিয়া লইতে থাকে এবং এইভাবে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করিয়া ইহাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া দেয়' ২৮।

সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রথম আঘাত শুরু হয় ১৭৬৩ সালে ঢাকার ইংরেজ কুঠির উপর। আর এর পরের আক্রমণ হয় রাজশাহী জেলার রামপুর-বোয়ালিয়ায় ইংরেজ কুঠির উপর। ১৭৬৩ সালের মার্চ মাসে সন্ন্যাসীদের দল কুঠির সমস্ত ধন সম্পদ লুট করে চলে যায় এবং কুঠির পরিচালক বেনেট সাহের তাদের হাতে নিহত হয়। ১৭৬৪ সালে বিদ্রোহীরা আবার রামপুর-বোয়ালিয়া কুঠি আক্রমণ করে ইংরেজ বণিক ও স্থানীয় জমিদারদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে। এই সময় উত্তরবঙ্গ ছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটি। ১৭৭২ সালে রংপুর শহরের নিকটবর্তী শ্যামগঞ্জের ময়দানে বিদ্রেহীদের সাথে সেনাপতি টমাসের যে সংঘর্ষ হয়, সেই যুদ্ধে স্থানীয় সকল গ্রামের কৃষকরাও তির ধনুক, লাঠি, বল্লম নিয়ে বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেন। এ প্রসঙ্গে রংপুর জেলার তৎকালীন সুপারভাইজার (তখনও কালেক্টরের পদ সৃষ্টি হয়নি) পার্লিং সাহেবের মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ন; তিনি লিখেছেন, 'কৃষকেরা আমাদের সাহায্য তো করেই নাই, বরং তাহারা লাঠি প্রভৃতি লইয়া সন্ন্যাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে। যে সকল ইংরেজ সেনা জঙ্গলের লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকাইয়া ছিল তাহাদিগকে তাহার খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিয়াছে। কোন ইংরেজ সৈন্য গ্রামে ঢুকিলে কৃষকগণ তাহাদের হত্যা করিয়া তাহাদের বন্দুকগুলি অধিকার করিয়া লইয়াছে' ২৯।

এই প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহে ফকিরদের প্রধান নেতা ছিলেন মজনুশাহ্ এবং সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলে ভবানী পাঠক। যদিও সরকারি নথিপত্রে ভবানী পাঠককে একজন 'ডাকাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের বর্ণনা অনুযায়ী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী একজন সামান্য জমিদার, যার সাথে ভবানী পাঠকের যোগাযোগ ছিল এবং ভবানী পাঠকের সাথে মজনু শাহেরও যোগাযোগ ছিল।

গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস প্রথম এই কৃষক বিদ্রোহকে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করেন। অপরদিকে ভারতের সরকারি ইতিহাস ও গেজেটিয়ার রচয়িতা স্যার উইলিয়াম হান্টার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই সন্নাসী বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে ঘোষণা করে লিখেছেন যে, 'বিদ্রোহীরা অন্য কেউ নহে, ইহারা হইল মোঘল সম্রাজ্যের ধ্বংস প্রাপ্ত সৈন্য বাহিনীর বেকার ও বুভুক্ষু সৈন্যগণ এবং জমিহারা গৃহহারা বুভুক্ষু কৃষকের দল। এই অন্ন-বস্ত্রহীন বেকার সৈন্য ও কৃষক উভয়েই জীবিকা নির্বাহের জন্য এই শেষ উপায়টি (বিদ্রোহ) অবলম্বন করতে বাধ্য হইয়াছিল' ৩০।

ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যবস্থাপনা ও কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের ইজারাদার দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ উৎপীড়নের প্রত্যক্ষ পরিণতি ছিলো ১৭৮৩ সালের 'রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ'। সেই সময় রংপুর দিনাজপুরের প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। এই কৃষকদের অধিকাংশই রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের। দেবী সিংহ ইজারা প্রাপ্তির পর স্থানীয় জমিদার ভুস্বামীদের উপরে যে হারে কর আরোপ করেন তার বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল অবিশ্বাস্য। কর পরিশোধ করতে না পারা ভুস্বামী ও প্রজা সকলের উপর নেমে আসে শারীরিক, মানসিক নানান রকমের উৎপীড়ন ও নির্যাতন। এই বিদ্রোহের সময় এমন অত্যাচারের অনেক করুণ ও লোমহর্ষক বিবরণ পাওয়া যায় নিখিল নাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনিতে। তিনি লিখেছেন-'যখন চাষীদের উপর এই করবৃদ্ধি ও তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের উপর পাশবিক অত্যাচার অবাধে চলিতে লাগিল, যখন তাহারা বন্য পশুর মত দলে দলে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অত্যাচারের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইল না, চক্ষুর সম্মুখে নিজেদের কুটির ও যথাসর্বস্ব অগ্নিমুখে ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন আর তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। কাজেই এই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উত্তরঙ্গের প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ করিল' ৩১।

রংপুরের কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৭৮৩ সালের শুরুতে বামনডাঙ্গা ও টেপা পরগনার যথাক্রমে বিদলাতুর ও কোরনার সোনা গ্রামে। একটি যৌথ পরিকল্পনার মাধ্যমে এই দুই অঞ্চলের কৃষকগণ সমবেতভাবে কইমারীর দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন ধীরাজনারায়ন, যাকে বিদ্রোহী কৃষকগণ 'নবাব' মনোনীত করে। রংপুর কৃষক বিদ্রোহের সর্বশেষ ঘটনা ছিল ১৭৮৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাটগঞ্জের যুদ্ধ। এ সময় লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড নিজে রংপুরের পশ্চিমাঞ্চলে একদল বিদ্রোহী কৃষকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই সংঘর্ষে ২৮ জন বিদ্রোহী কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন নেতৃত্বস্থানীয়। ম্যাকডোনাল্ড কৃষকদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেন এবং বিদ্রোহে লিপ্ত হলে গুলিবর্ষণের হুমকি দেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তার কঠোর পদক্ষেপ ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি কৃষক শক্তিকে অনেকেটা দুর্বল করে দেয়। তবে বিভিন্নভাবে বিদ্রোহীদের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মোগলহাটের লড়াই। এই লড়াইয়ে ৬০ জন কৃষক নিহত হয় এবং ৫৬ জন বিদ্রোহী কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের সকলেই ছিল মারাত্মকভাবে আহত। এই পরিস্থিতিতে রংপুরের সৈন্যশক্তি বৃদ্ধি করে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। এই বিদ্রোহে অনেক ব্যক্তির ত্যাগ ও নেতৃত্বের অবদান থাকেলও ধীরাজ নারায়ন, শেখ কেনা সরকার ও নুরুলদীন ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা ও বিদ্রোহীদের মনোনীত 'নবাব'। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো নুরুলদীনের ভূমিকা। নুরুলদীন ছিলেন একজন 'বসুনিয়া নবাব' এবং তিনি স্বাধীনতার সনদ নিয়ে আবির্ভূত হন বিদ্রোহী কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে। সরকারি বিবরণীতে বলা হয়েছে, "সম্মানিত 'নবাব' উপাধি ধারন করে রাজমুকুট শোভিত নুরুলদীন স্বাধীনতার সনদ নিয়ে আবির্ভূত হন' ৩২।

রংপুরের কৃষক প্রজা বিদ্রোহের প্রধান কারণ কোম্পানির রাজস্ব ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারের কাহিনির অন্যতম প্রামাণ্য দলিল ঘটনার সমসাময়িক (অষ্টাদশ শতক) রংপুরের ইটাকুমারীর কবি রতিরাম দাসের কবিতা জাগের গান। উক্ত কবিতার উদ্বৃতাংশ নিম্নরূপ ঃ

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময় মুল্লুকেতে হইল বার ঢিং*।।
যেমন যে দেবতার মুরতি গঠন।
তেমন হইল তার ভূষন বাহন।।
রাজার পাপেতে হইল মুল্লুকে আকাল।
শিয়রে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল।।

কত যে খাজনা পাইবে তার নেকা নাই।
যত পারে তত নেয় আরও বলে চাই।।
দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল।।
মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার।। ৩৩

উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহের গুরুত্বপুর্ণ সংযোজন পাবনার 'সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ'। কৃষকদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠান এবং জমিদারী শোষণের অবসান ঘটানোই ছিল এই বিদ্রোহের মূল বিষয়। সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ কেবল জমিদার গোষ্ঠীর কৃষক শোষনের চক্রান্ত ব্যর্থ করেই ক্ষান্ত হয়নি, কৃষি জমির দখল থেকে প্রজা উচ্ছেদের নিরঙ্কুশ অধিকার দানকারী বিভিন্ন আইন রদ করে '১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' বিধিবদ্ধ করতে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করেছিল। জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের পর জমির উপর প্রজার দখলী স্বত্বের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই আইন এক অতি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা। সেদিক থেকে বঙ্গদেশের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শাসকগণও এই বিদ্রোহের গুরুত্ব স্বীকার করে লিখেছেন, 'পাবনা জেলার ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের কৃষক বিদ্রোহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, ইহারই পরিণতি স্বরপ কৃষি ভূমির উপর প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্মন্ধে পূর্ণ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই আলোচনারই চুড়ান্ত ফল হিসেবে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল 'প্রজাবৃন্দের সনদ বলিয়া কথিত ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' ৩৪।

'সমসাময়িক কালে বগুড়ার কোন কোন অঞ্চলের এবং রাজশাহীর নাটোরের কৃষক বিদ্রোহ ছিল পাবনার সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের সম্প্রসারন' ৩৫।

৫. কৃষক বিদ্রোহে প্রান্তিক আদিবাসী

উত্তরবঙ্গের বিগত তিন শতাব্দীতে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এইসব আন্দোলন সংগ্রামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় দেখা যায় যে, এই সকল আন্দোলনে কোন সুফল অর্জিত হলে তার অধিকাংশই জমা হয় সমাজের উপরিতলে অধিষ্ঠিত বড় মানুষদের বড় বড় ঝুড়িতে, আর মাঠে ঘাটে মার খাওয়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অগ্রসৈনিকদের কপালে জোটে এর বিরুপ প্রতিক্রিয়ার মর্মান্তিক প্রতিফল। ইতিহাসের কথিত উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ক্ষমতাসীনদের শক্তিশালী হাতের ছোঁয়ায়। প্রান্তিক মানুষের অবদান রয়ে যায় অবহেলায়, নিষিদ্ধ ইতিহাসের অন্ধকারে। ইতিহাসের সাজানো সাজ ঘরে তাদের প্রবেশ নিষেধ। তাই এইসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ত্যাগসর্বস্ব সংগ্রামী জীবনের ঐতিহাসিক অবদানের পৃথক মূল্যায়ন দেশের বৌদ্ধিক সমাজের মনোযোগের অপেক্ষা রাখে।

উত্তরবঙ্গের সীমানায় বসবাসকারী প্রান্তিক আদিবাসীদের আন্দোলন সংগ্রামের রয়েছে এক ঐতিহ্যবাহী দীর্ঘ ইতিহাস। ১৮৩১-৩২ সালে পরিচালিত কোল বিদ্রোহ, ১৮৭৪ সাল থেকে সাতাশ বছরব্যাপী বীর নায়ক বীরসা মুন্ডা পরিচালিত মুক্তির লড়াই এবং ১৮৫৫ সালে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহসহ আরো অনেক আন্দোলন সংগ্রামে রয়েছে আদিবাসী সমাজের সেইসব গর্বিত ইতিহাস। ইংরেজ শাসন, জমিদার শ্রেণি ও ইজারাদারদের শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলন সংগ্রাম ও যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল। চল্লিশের দশকে সংগঠিত 'তেভাগা আন্দোলন' উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনে আদিবাসী সাঁওতালদের ভূমিকা ছিলো অগ্রভাগে এবং তাদের সাথে ওরাওঁ ও মুন্ডারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৩৯ সালে কিষান সভার নেতৃত্বে রংপুর ও দিনাজপুরে বর্গাচাষীরা এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে। ভাগচাষীগণ উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক ভাগের পরিবর্তে দুই তৃতীয়াংশ দাবি করে। এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিল

নিখিল ভারত কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গদল কিষান সভার বাংলা প্রদেশ শাখার সক্রিয় সদস্যদের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। কিষান সভার পরিচালনায় সংঘটিত এই তেভাগা আন্দোলন সাংগঠনিক দিক থেকে ছিল শক্তিশালী। গণকমিটি, গণআদালত গোয়েন্দা বিভাগ, গণতহবিল ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠন তেভাগা আন্দোলনের শক্তিশালী সাংগঠনিক তৎপরতার ইঙ্গিত বহন করে। এইসব সংগঠনের ভূমিহীন, গরিব ও মাঝারি কৃষক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধনী কৃষকও অংশগ্রহণ করে। আন্দেলনে রংপুর ও দিনাজপুরসহ কয়েকটি জেলায় উপজাতি কৃষকের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। তেভাগা চাষীরা নিজেদের আঙ্গিনায় উৎপাদিত ফসলের সমাবেশ ঘটাতো বণ্টনের জন্য। জোতদারদের ধানের গোলা আক্রমণ ও লুটপাট করত দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ আদায়ের জন্য। জোতদারকে উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হতো। জোতদার এই বণ্টনে রাজি না হলে তার ভাগটি গণ ভাণ্ডারে জমা হতো। দিনাজপুর, রংপুরসহ বাংলার ১৯টি জেলায় এই আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছিল। এসব এলাকায় জোতদারের বাহিনী ও পুলিশের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামও সংঘঠিত হয়। সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কোন কোন এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছিল। 'তেভাগা আন্দোলনে মহিলারাও অংশগ্রহণ করে, যাদের অধিকাংশই ছিল উপজাতি সম্প্রদায়ের '৩৬।

১৯৪৬ সালে অখণ্ড বাংলার উত্তরবঙ্গসহ অন্যান্য অঞ্চলে অবিস্মরণীয় আধিয়ার বিদ্রোহ বা তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই সংগ্রামের প্রধানকেন্দ্র ছিল দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলের বর্গাচাষিরা 'আধিয়ার' নামে পরিচিত। আর এই আধিয়ার কৃষকদের অধিকাংশই ছিল রাজবংশী বা ক্ষত্রিয় এবং সাঁওতাল। ঐ সংগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং কৃষক সমিতির পরিচালনায় সংগঠিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত আধিয়ার কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহের যে ব্যাপক বিস্ফোরণ সেদিন ঘটেছিল, তা অভূতপুর্ব ও অবিস্মরণীয়। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ত্রিশটি থানার মধ্যে বাইশটি থানার আধিয়ার কৃষকেরা ওই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল। এক দিনাজপুর জেলাতেই চারটি অঞ্চলে পুলিশের গুলি চালনায় চল্লিশজন কৃষক শহিদ হয়। দু'হাজার কৃষক কারাবরণ করে। 'শয়ে শয়ে কৃষক কর্মী গ্রেফতারী পরোয়ানা উপেক্ষা করে সংগ্রাম পরিচালনা করে ও আত্মগোপন করে থাকে' ৩৭। তেভাগার রাজনৈতিক প্রস্তুতি সম্পর্কে সেই সময় দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনের দায়িত্বে থাকা অন্যতম নেতা সুশীল সেন আরও জানান যে, ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে, কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটি ও জেলা কৃষক সমিতির যুক্ত বৈঠকে জেলার তেভাগা আন্দোলনের বিস্তৃত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নেওয়া হয়। যে তিনটি দাবির ভিত্তিতে সংগ্রাম শুরু করা স্থির হয়, তা হলো 'নিজ খোলানে ধান তোলো', 'আধি নাই তেভাগা চাই', 'কজ্জা ধানের সুদ নাই'। পরিকল্পনার সময় নিজ খোলানে ধান তোলার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'ঠাকুরগাঁও পশ্চিম অঞ্চলের ঠুমনিয়া গ্রামে প্রথম ধান কাটা শুরু হয়' ৩৮। সুশীল সেনের বক্তব্য মতে তেভাগা আন্দোলনে প্রথম ধান কাটা দিয়ে শুরু ঠাকুরগাঁও-এর ঠুমনিয়া গ্রামে। 'তার বক্তব্যের সমর্থনে অজিত রায় বলেছেন, তেভাগা আন্দোলনের সূচনা হিসাবে আটোয়ারী থানায় কমরেড সুশীল সেনের নেতৃত্বে ধান কাটা শুরু হয় এবং কমরেড সেন গ্রেফতার হন' ৩৯। এ ব্যাপারে ঐ এলাকার দায়িত্বে থাকা অন্যতম নেতা কমরেড গুরুদাস তালুকদার বলেন যে, 'দিনাজপুর জেলায় প্রথম আন্দোলনের সুচনা হয় ১৯৫৩ বঙ্গাব্দের ১৪ই পৌষ। এই দিন থেকে কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ধানকাটা শুরু হয়' ৪০। উল্লেখ্য যে, সেইসময় আটোয়ারী থানা ঠাকুরগাঁও মহকুমার অধীনে দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৪৭ সালের ৪ জানুয়ারি দিনাজপুর শহরের কাছে চিরিরবন্দর এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ কৃষকদের উপর প্রথম গুলি চালনা করে। গুলিতে কমরেড শিবরাম ও সমিরুদ্দিন নিহত হন। তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শহিদ শিবরাম ও সমিরুদ্দিন। সমিরুদ্দিন ছিলেন ক্ষেতমজুর আর শিবরাম ছিলেন গরিব সাঁওতাল আধিয়ার। 'ওই সংঘর্ষে একজন

সশস্ত্র পুলিশও তিরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়' ৪১। এতে, আন্দোলনের গতি আরও তীব্রতা পায়। সরকার আন্দোলন প্রতিহত করার মানসে দমনপীড়নের পথ বেছে নেয়। জেলার বিভিন্ন স্থানে পয়ত্রিশটি সশস্ত্র পুলিশ ক্যাম্প বসে। তেভাগা সংগ্রাম দমন করার জন্য সেইসব ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে শুরু হলো গ্রামে গ্রামে সামরিক কায়দায় ব্যাপক পুলিশি অভিযান। বালুরঘাট মহকুমার পতিরাম, খাঁপুর অঞ্চলেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শয়ে শয়ে লাঠিধারী ভলান্টিয়ার পতিরামের জোতদারের খোলান ভেঙ্গে আধিয়ারদের ধান নিজ নিজ খোলানে তুলে দেয়। পতিরামের পাশ্ববর্তী গ্রাম খাঁপুরে আন্দোলন শুরু হয়। জোতদাররা পুলিশ ডাকে, সতের জন আধিয়ার কৃষকের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে দু'গাড়ি সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে প্রবেশ করে এবং এলোপাথাড়ি গ্রেফতার শুরু করে। কৃষকেরা অন্যায় গ্রেফতার প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায়। বিরাট কৃষক বাহিনীর সামনে পুলিশ একশো একুশ রাউন্ড গুলি চালায় ও বাইশ জনকে হত্যা করে। পুলিশের গুলিতে বহু সংখ্যক আহত হয়। ওই হত্যাকাণ্ডও কৃষকদের দমন করতে পারে নাই। পুলিশ তখন খুনের নেশায় মেতে উঠেছে। খাঁপুর কৃষক হত্যার পরদিনই ঠাকুরগাঁও পশ্চিম অঞ্চলের ঠুমনিয়ায় গুলি চলে। 'কমরেড সুকুরচাঁদ সিং ও তার স্ত্রী সুনীমা সিংসহ চারজন কৃষক পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন' ৪২ অপরদিকে, 'বালুরঘাটের খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত ঐ বাইশজন কৃষকের মধ্যে নজনই ছিল আদিবাসী সাঁওতাল' ৪৩।

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে এই তেভাগা আন্দোলন ভিন্নরূপ ধারণ করে। সেখানে চা বাগানের শ্রমিক এবং রেলওয়ে শ্রমিকরাও স্থানীয় কৃষকদের সাথে তেভাগা আন্দোলনে যোগ দেন। এখানকার চা বাগান শ্রমিক এবং রেলওয়ে শ্রমিকরা অধিকাংশই ছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের। সেখানে তেভাগা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিমল দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'জেলা শাসক দোমহনিতে ১৪৪ ধারা জারি করে জনসভা নিষিদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু ডুয়ার্সের যে গনদেবতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তাকে শাসন করার ক্ষমতা জেলা শাসকদের ছিল না। ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বিশাল সভা হলো, কমরেড জ্যোতিবসু ঐ সভায় ভাষণ দেন। সকলেই উৎসাহিত হয়ে ফিরে চললেন। তিনি আরো লিখেছেন, 'মহাবাড়ি বস্তির বড় জোতদার গয়নাথের খোলানে তেভাগা একটি স্মরণীয় ঘটনা। মেলেটি থানা মহাবাড়ি বস্তি থেকে মাল থানার পনোয়ার বস্তিতে অবস্থিত কৃষক সমিতির অফিস পর্যন্ত পাঁচ মাইল রাস্তার যোগাযোগ বন্ধ করে কৃষক শ্রমিকরা তেভাগা করছিলেন। পুলিশ বাহিনী জোতদারের পক্ষ হয়ে তেভাগাকারী কৃষক শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। গুলিতে নয়জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। সাতজন গুরুতর আহত হন। গুলি খাওয়া আহতদের মধ্যে ছিলেন বাতাবাড়ী চা বাগানের পাতরাশ ওরাওঁ ও দলাবাড়ি চা বাগানের জিতু কুমার, হোসনা ওরাওঁ, মঙ্গরু ওরাওঁ সাতগাঁ বস্তির ভুলন ওঁরাও, দক্ষিণ ওদলা বাড়ি বস্তির বুধু ওরাওঁ, শুকা ওরাওঁ প্রমুখ' ৪৪। বর্ণিত আহতদের তালিকা পর্যালোচনা এবং ধনঞ্জয় যার সম্পাদিত 'তেভাগা আন্দোলন' বইয়ের পরিশিষ্টে সংযোজিত শহিদদের তালিকা যাচাই করে প্রতীয়মান হয় যে, ডুয়ার্সের এই গুলি বর্ষণের ঘটনায় শহিদ আন্দোলনকারীদের প্রায় সকলেই ছিলেন আদিবাসী জনজাতি।

দিনাজপুর জেলা ছিল তেভাগা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। ১৯৩৯ সালের মে মাসের প্রথম দিকে ফুলবাড়ী থানার লালপুর থানায় মুজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে কৃষক সম্মেলন হয়। বহু সংখ্যক সাঁওতালসহ কোচ ও রাজবংশী অংশ নিয়েছিল এই সম্মেলনে। আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই সাঁওতাল রাজবংশী কৃষকরা তির-ধনুক, লাঠি ও মাদলসহ কৃষকদের সভার বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর শহরে প্রকাশ্যে জঙ্গী মিছিল বের করে। 'দিনাজপুরের আদিবাসী সমাজ' এর লেখক মেহরাব আলীর বিবরণের মাধ্যমে জানা যায় যে,' রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের নির্দেশে সশস্ত্র পুলিশ কৃষকদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে তির ধনুকের সঙ্গে গোলাগুলির সংঘর্ষ হয়। পঁয়ত্রিশ জন কৃষক (যার মধ্যে অধিকাংশই সাঁওতাল) প্রাণ হারান। আহত হন অসংখ্য' ৪৫।

তেভাগার দাবি সেদিন দিনাজপুর জেলার নিপীড়িত আধিয়ার কৃষকদের মনে কত গভীর রেখাপাত করেছিল সে সম্পর্কে ছোট একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। খাঁপুরে গুলিচালনায় যেসব কৃষক গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন তাদেরকে বালরুঘাট হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার মৃত্যু পথযাত্রী একজন কৃষককে তার শেষ ইচ্ছা জানাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী চান? ক্ষীণ অস্ফুট কণ্ঠে সংগ্রামী কৃষকটি উত্তর দিলেন,' তে-ভাগা চাই'। পরমহূর্তে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন'৪৬।

তেভাগা আন্দোলনে জোতদার ও পুলিশের হাতে বাঙালি, আদিবাসী, নারী-পুরুষ মিলে প্রায় ৭০জন কৃষক প্রাণ হারান। কেন্দ্রীয় সংগঠকদের দাবি অনুযায়ী কেবলমাত্র দিনাজপুর জেলাতেই ৪০ জন কৃষক নিহত, ১২০০ জন গ্রেফতার এবং প্রায় ১০ হাজার আহত হয়েছিল। যতদূর জানা যায়, তৎকালীন সরকারের নির্দেশে পুলিশ ২২টি ঘটনায় গুলি বর্ষণ করে এবং চব্বিশ পরগনা, রংপুর, দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় নারী ধর্ষণের মত ঘটনাও ঘটে। সর্বমোট ৩১১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং আদালতে তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলেছিল' ৪৭। যাইহোক, সেই সময় জাতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে শ্রেণি চেতনার স্রোত আচ্ছন্ন হওয়া, দেশভাগ, নতুন মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতি এবং সংগঠনের গুণগত দুর্বলতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে তেভাগার প্রথম পর্বের আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে ১৯৫০ সালে তৎকালীন রাজশাহী জেলার নাচোল ও নবাবগঞ্জে ইলা মিত্র ও রমেন মিত্রের নেতৃত্বে আবার কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। এর সময় ও স্থানের পরিসর ছিল অল্প, কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা ও ক্ষতির পরিমান ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। '৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনের থেকে 'নাচোল বিদ্রোহের' আন্দোলন কিছুটা আলাদা মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।
এই আন্দোলনে মূল ক্ষেত্রভুমি ছিল নাচোল থানা এলাকা এবং সেখানে বসবাসকারীদের অধিকাংশই আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। আন্দোলনকারীরাও অধিকাংশই আদিবাসী সাঁওতাল। আন্দোলনের মূলকেন্দ্র চন্ডিপুর গ্রাম, মাতলা মাঝির বাড়ি। এই বাড়িতে বসেই আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সদস্য ছিলেন কমরেড অনিমেশ লাহিড়ী, কমরেড আজহার শেখ, কমরেড শিবু, কমরেড রমেন মিত্র, কমরেড ইলা মিত্র, কমরেড মাতলা মাঝি, কমরেড হীরা সিং, কমরেড উপেন সিং, কমরেড চুনু মাঝি, কমরেড বৃন্দাবন সাহা। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই আন্দোলনের স্লোগান নির্ধারণ করা হয় - 'তেভাগা মানতে হবে, 'সাতআড়ি জিন মানতে হবে'।

বাংলার প্রতিটি মানুষ তেভাগা বোঝে। কিন্তু 'সাত-আড়িজিন' আঞ্চলিক কথা। এর ভেতরের ব্যাপারটা হলো, ক্ষেত মজুররা জোতদারের জমিতে ধান কেটে মাড়াই ও ঝাড়াই করে জোতদারের গোলায় তুলে দিতে হবে। বিনিময়ে তারা মজুরি পাবে তিন আটি ধান। একেই বলে জিনজাটা। সংগ্রাম কমিটি আওয়াজ তুললো, তিন আটিতে মজুরি পোষায় না। সাত আটি জিন দিতে হবে' ৪৮। পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত মতে তেভাগা করা মিটিং মিছিল চলতে থাকে এবং ক্রমে তা তীব্রতর রূপ ধারণ করে। পরিস্থিতির কথা স্থানীয় জোতদার ভূস্বামীরা উপর মহলে যোগাযোগ করে জানালে একদিন সকাল বেলা গরুর গাড়িতে চড়ে নাচোল থানার দারোগা তিনজন সেপাই সহ ঘাসুয়া গ্রামে এসে হাজির হয়। স্থানীয় জোতদারদের নানান অভিযোগ শোনে পাশের এক খামারে কর্মরত দুই আদিবাসীকে দেখে তাদের প্রতি রাগের উদ্রেক হয় এবং আদিবাসীদ্বয়কে গাছে বেঁধে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। এই খবর চন্ডীপুরের সংগ্রাম কমিটি অফিসে পৌছলে বিভিন্ন দিক থেকে নাগরা বাজিয়ে লোকজন খামারের দিকে সমবেত হয়। উত্তেজিত জনতা ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে চারজন পুলিশকে হত্যা করে মাটি চাপা দেয়। এই ঘটনাটি ঘটে ৫ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে।

ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পরদিন ৬ জানুয়ারি সামরিক বাহিনীর ফৌজ চন্ডীপুর ও তার আশপাশের গ্রামগুলিতে আক্রমণ চালায়। তারা বেধড়ক গোলাগুলি আর অগ্নি সংযোগ করতে করতে একগ্রাম থেকে আর এক গ্রামে এগিয়ে যেতে থাকে। সেদিন এই আদিবাসী গ্রামগুলিতে যে নারকীয় তাণ্ডব পরিচালিত হয়েছিল তার এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা আমরা দেখতে পাই সম্প্রতি প্রকাশিত কমরেড বৃন্দাবন সাহার আত্মজৈবিক রচনা 'দুটি বিদ্রোহের কথা, ঠাকুরবাড়ির জমিদারীতে প্রজাদের, 'নাচোলে কৃষকদের' নামক গ্রন্থটিতে। একজন অংশীজন হিসেবে প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে তিনি লিখেছেন 'গুলির তাপে পলানীয়া পাড়ায় আগুন লাগলো। পুড়ে ছাই হয়ে গেল পূর্বদিকের একটি বাড়ি। ফৌজরা ঢুকে পড়লো কমরেড চুনু মাঝির পাড়ায়। সমস্ত পাড়ায় অগ্নিসংযোগ করে বেড়িয়ে গেল পূর্বদিকে, সোজা চলে গেল ওখান থেকে আধমাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমাদের কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির অফিস যেখানে ছিল সেই চন্ডীপুরে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো চন্ডীপুরে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আর স্লোগান দিচ্ছি। এরপরই জগদ্দল গ্রামের পালা। সেখানেও আগুন জ্বলে উঠল' ৪৯।

ঘরবাড়ি ছেড়ে লোকজন পালাতে থাকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কমরেড ইলা মিত্র এবং কমরেড বৃন্দাবন সাহা পরদিন সকালে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রার প্রাক্কালে রহনপুর রেল স্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ধরা পড়ার পর তাদের উপর এবং পরবর্তীতে ধৃত আদিবাসী সাঁওতাল পুরুষ মহিলাদের উপর যে অমানবিক ও পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে তার এক বিভীষিকাময় ও বীভৎস বিবরণ তুলে ধরেছেন তার এই স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, 'গরু-ছাগল' কুকুর-বিড়ালের প্রতিও মানুষের দরদ থাকে। কিন্তু দেখছি মানুষের উপর সে দরদ মানুষের অনুপস্থিত। আমি না হয় পুলিশ হত্যাকাণ্ডের নায়ক, কিন্তু আমার সঙ্গে যে আদিবাসীদেরকে এরা নির্দয়ভাবে পেটাচ্ছে তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। এরা আন্দোলনের সম্পূর্ণ বাইরে। এদের কাউকে আমি চিনি না। কিন্তু এদের একমাত্র অপরাধ এরা আদিবাসী। সেদিনের নাচোল চন্ডিপুর আন্দোলনে আদিবাসী সম্প্রদায় ছিল সক্রিয়'৫০।

নিরীহ নারীদের উপর নারকীয় নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'অনেকক্ষণ পর একটু সংজ্ঞাহীনতার ঘোর কেটে গেল। বাইরে আদিবাসী মহিলাদের কাতর চিৎকার শুনছি। একসঙ্গে অনেকগুলো পশু যে ওদের উপর বলাৎকার শুরু করেছে তা বুঝতে পারলাম। পাশের সেলেই কমরেড ইলা মিত্র। ভদ্রকন্যা, উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা কমরেড। তাঁর উপরও শুরু হয়েছে পাশবিকতা। তিনি আর্তনাদ করছেন। কিন্তু সব বৃথা।... নাৎসী জেলখানার অনেক অত্যাচারের খবর শুনেছি কিন্তু সংজ্ঞাহীনা বা অর্ধমৃতা কোন মহিলার উপর এমন অত্যাচার যে হয়েছে তা শুনিনি। আজ এরা নাৎসী জেলখানাকেও হার মানালো। আদিবাসী মহিলাদের ইজ্জত খেয়ে তাদের মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু কমরেড ইলা মিত্রকে মুক্তি দেয়নি। এ প্রসঙ্গে পরের বর্ণনায় তিনি আরও লিখেছেন,'রাতে ঘুম নেই, ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রাচ্ছন্ন হচ্ছি। কী যেন স্বপ্ন দেখছি। আবার তন্দ্রার ঘোর কেটে যাচ্ছে। বাইরে আরও একদল আদিবাসী মহিলাদের ধরে আনা হয়েছে। তাদের উপরও নারীলোলুপ নর-পিশাচের দল ধর্ষণ শুরু করেছে। আদিবাসী মহিলাদের মর্মভেদী আর্তনাদ ক্ষণে ক্ষণে আমার তন্দ্রার ঘোর কেটে দিচ্ছে। সেলের ভিতরে হা-হুতাশ আর কাতরানি। কমরেড মিত্র পাশের সেলেই ছিলেন, তাঁর কোন সাড়া পাচ্ছি না। এমনি করেই সেই ভয়ংকর রজনীর সমাপ্তি ঘটল' ৫১।

নাচোল বিদ্রোহে নিজের বন্দিজীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পাশাপাশি আদিবাসীদের দুর্ভোগ, দুর্দশা ও পাশবিক অত্যাচারের বাস্তবচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'চন্ডিপুরের যেসব লোক পালিয়ে গিয়েছিল তারা অধিকাংশই মহামন্দার কিনারে, ঝোপেঝাড়ে, আত্মীয়দের বাড়িয়ে ধরা পড়তে লাগলো। লুথু মিঁয়া এবং বুধু মিঁয়া নামক দুই ভাই এইসব পলাতক আদিবাসীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে বেশি সাহায্য করেছিল। লুথু মিঁয়া ছিল বড় ভূস্বামী। দিয়াড় অঞ্চলে এদের বাড়ি। সিপাইরা চন্ডিপুরে এদের খামার বাড়িতে ক্যাম্প বসায়। এই ক্যাম্পে কত

রকমের বীভৎস নারকীয় অত্যাচার যে হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা দুষ্কর। আদিবাসী প্রত্যেকটি যুবতী নারীর শ্লীলতাহানি করা হয়েছিল এবং তা ঘটানো হয়েছিল স্বামী, পিতা বা ভাইয়ের সামনে। এদের উপর শারীরিক নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি অন্যত্র আরো বলেছেন-'আদিবাসী প্রত্যেকটি বন্দিকে প্রথমে ভয়ংকরভাবে পেটানো হয়, তারপর একটি মোটা বাঁশ দিয়ে তার পিঠে এমনভাবে চাপ দেওয়া হয় যে তার ফলে প্রত্যেকটি বন্দিই পায়খানা করে ফেলে। এই সাংঘাতিক নির্যাতনের পর যখন বন্দিটি জল জল করে চেঁচাতে থাকে তখন তার মুখে প্রস্রাব করে দেয়। এমনকি প্রস্রাব খেতে পর্যন্ত বাধ্য করেছে' ৫২।

১৯৫০ সালে নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে নিরীহ আদিবাসী সমাজের উপর রাষ্ট্রের যে নির্মম আচরণ, তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে এই স্মৃতিচারণমূলক আত্মজৈবনিক গ্রন্থটির মুখবন্ধে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন, 'নিরীহ আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন, বিশেষ করে গণধর্ষণ যেভাবে চলেছে, সে যেন একাত্তরে যা ঘটবে তারই পূর্বাভাস। রাষ্ট্র একই, শুরুর নির্মমতা সমাপ্তিতে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ১৯৫০ এ পুলিশ বাহিনীর বাঙালী সদস্যরা সাঁওতালদের ওপর জুলুম চালিয়েছে, ১৯৭১ এ ওই পুলিশ বাহিনীই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পাকিস্তানের সেনাদের হাতে ঠিক সেই ভাবেই নিষ্পেষিত হয় যেভাবে তাদের হাতে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা নিষ্পেষিত হয়েছিল। ১৯৫০ এ বাঙালি পুলিশ সাঁওতাল মেয়েদের ধর্ষণ করেছে।

১৯৭১-এ পাঞ্জাবী সেনারা বাঙালি মেয়েদের ওপর ওই একই কাজ করেছে। একুশ বছরের ব্যবধানে রাষ্ট্র আরো নির্মম হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রটি যে কেমন হবে তাতো পঞ্চাশ সালেই বোঝা গিয়েছিল। একাত্তরের নির্যাতন মাত্রায় ও ব্যাপকতায় অনেক বেশি ছিল অবশ্যই, কিন্তু সেটা পরিমাণগত পার্থক্য গুনগত নয়' ৫৩।

যাযাবর জীবনে হাজার বছরের বঞ্চনা, শোষণ আর নিপীড়নে অতীষ্ট এইসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বেদনার অসহায় আর্তি ও হতাশার সুর যেন অজানা অন্ধকার অতীত থেকে আজও ভেসে আসে...

"ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি থাকেন বহু-বহু দূরে। আমাদের রক্ষা করিবার কেহই নাই।"

তথ্যসূত্র :

১। মাহবুব সিদ্দিকী, উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয় ও প্রশাসনিক বিভাজন, মনন রেখা, জুন, ২০২২; সম্পাদক: ড: মিজানুর রহমান নাসিম।
২। আনন্দ গোপাল ঘোষ, ঔপনিবেশিক শাসনামলে উত্তরবঙ্গ (১৭৬৫-১৯৪৭), মননরেখা, প্রাগুক্ত।
৩। সমিত ঘোষ, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০০৯।
৪। অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, বাংলাদেশের আদিবাসী (তৃতীয় খন্ড) পৃষ্ঠা : ৩৬, উৎস প্রকাশন, ঢাকা- ২০১০।
৫। ড: সৌরভ সিকদার, আদিবাসী শিশুর মাতৃভাষায় মৌলিক শিক্ষা, নিজভূমে পরবাসী, বাংলাদেশের আদিবাসী, ডিসেম্বর-২০১৪, গণস্বাক্ষরতা অভিযান; সম্পাদনা : শফি আহমেদ, রাশেদা কে চৌধুরী।
৬। গোলাম মুরশিদ, বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য, প্রথমা প্রকাশন, পৃষ্ঠাঃ ২০২।
৭। গাস্তঁ দোরেন, একটি ভাষার মৃত্যু; সূত্র : কালের খেয়া, দৈনিক সমকাল, তারিখ : ২৮-১০-২০২২।
৮। আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, বরেন্দ্রভূমির চিরায়ত বাসিন্দাঃ নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, গতিধারা, ঢাকাঃ ২০০৯।
৯। আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।
১০। আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।
১১। আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯।

১২। আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।
১৩। বাংলাদেশের আদিবাসী (এথনোগ্রাফিয় গবেষণা) তৃতীয় খন্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা- ২০১৫।
১৪। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, রংপুর, ১৯৯০, পৃষ্ঠা: ৬১।
১৫। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, রংপুর, ১৯৯০, পৃষ্ঠা: ৫০।
১৬। W.W Hunter.ও bid. তথ্যসূত্র : নাজমুল হক, বাংলাদেশের লোক সাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০৭, পৃষ্ঠা: ৩৯।
১৭। নাজমুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯-৫০।
১৮। আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৫।
১৯। নাজমুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯।
২০। আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৬।
২১। নাজমুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯-৫০।
২২। সমিত ঘোষ, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০০৯, পৃ: ২০৯।
২৩। তথ্যসূত্র: মোস্তফা তোফায়েল হোসেন, বৃহত্তর রংপুরের ইতিহাস, বর্ণসজ্জা, রংপুর, ২০১১; পৃষ্ঠা-৪৮৫।
২৪। সমিত ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃ: ২০৮।
২৫। সমিত ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃ: ২০৮।
২৬। সমিত ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃ: ২০৯।
২৭। রতন লাল চক্রবর্তী, প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ, বাংলাদেশের ইতিহাস, সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ১৮৪।
২৮। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুক ওয়ার্ল্ড, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা; ১৭-১৮।
২৯। সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা; ৩১।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নাচ।